নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খন্ড ৪

ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

সম্পাদক

হাসান শরীফ আহমেদ

সম্পাদনা পরিষদ

সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম, সাদিয়া এ চৌধুরী

কানিজ ফাতেমা ও মুঃ গোলাম সাত্তার

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

প্রকাশক : গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক
৩৫৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২১২

১৯৯৪-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ২৭টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষকগণের একান্ত নিজস্ব।

সুচিপত্র

সম্পদীয় ঃ রজত সয়ন্তী সংখ্যা ১

ব্র্যাক গবেষণার একুশ বছর ঃ কিছু প্রাসংগিক কথা ৪

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পাইলট সঞ্চয় প্রকল্পের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন ১০

গ্রামীন জনগণের সমস্যা মোকাবেলা ও বেঁচে থাকার কৌশল ১৫

মতলব থানায় ব্র্যাকের দু'টি স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা ১৮

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার উপর একটি সমীক্ষা ২২

মোরগ-মুরগী পালনে ভূমিহীন দরিদ্র নারী সমাজ ঃ পাঁচটি গ্রামের চিত্র ২৬

ব্র্যাকের মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের সমস্যা ঃ একটি সমীক্ষা ৩১

ব্র্যাকের অর্থপুষ্ট প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি ঃ মতলব এলাকার সাতটি ক্ষুদ্র ব্যবসার
উপর একটি সমীক্ষা ৩৫

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনভুক্ত পাঁচ জন মহিলা সদস্যার সাফল্যের খতিয়ান ৩৯

সদস্যদের গ্রাম সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার কারণ ঃ একটি সমীক্ষা ৪৩

গ্রাম সংগঠনের গঠন প্রক্রিয়ার উপর একটি পর্যবেক্ষণ ৪৮

গ্রামীণ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনা ঃ জামালপুর জেলার নারায়নপুর গ্রামের একটি চিত্র ৫৩

কাজের সময়, আয় ও ব্যয়ের ঋতু ভিত্তিক তারতম্য ঃ একটি সমীক্ষা ৫৮

ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অপ্রচলিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ৬১

মহিলা প্রধান খানায় কী কী কারণে মহিলারা ঝুঁকির সম্মুখীন হন ৬৭

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মতলব এলাকার আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর ব্র্যাক-
আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্পের বেজলাইন জরিপ ৭৩

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মায়েদের ধারণা ৭৮

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের পুষ্টিহীনতা ঃ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষপট ৮১

ব্র্যাকের পুষ্টি বিষয়ক কয়েকটি গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন ৮৬

ব্র্যাকের 'ওয়াচ' প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি গবেষণা ৯১

স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক বিক্রয় ঃ সমস্যা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা ৯৮

যৌনব্যধি সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষাঃ দু'টি এলাকার চিত্র ১০২

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক একটি মূল্যায়ন ১০৫

খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি ও এর ব্যবহারবিধি গ্রামীণ মায়েরা কতদিন
মনে রাখতে পারেন ? ১১০

ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় প্রসূতি মৃত্যুর কারণ
ও এতদসংশিষ্ট বিষয়সমূহের উপর সমীক্ষা ১১৫

পলী এলাকায় ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু হারে পরিববর্তন ১১৯

ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ঃ চিকিৎসা সমাপ্তকারী রোগীদের উপর একটি সমীক্ষা ১২২

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চার উপর একটি সমীক্ষা ১২৫

রজত জয়ন্তী সংখ্যা

পাঁচ মাসের ব্যবধানে নির্যাসের ৪র্থ খন্ড আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আমাদের কথা রাখতে পেরেছি। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সম্পাদনা ও প্রকাশনা শাখার নিরলস প্রচেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট গবেষক, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণ, বিশেষ করে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালকের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এত অল্প সময়ে ৪র্থ খন্ডটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ'শ গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এ গবেষণা প্রতিবেদনগুলোর বেশির ভাগই ইংরেজী ভাষায় লিখিত। তাই এ সকল গবেষণার ফলাফলের বোধগম্যতা বজায় রেখে সহজ ও সাবলীলভাবে বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ করে ব্র্যাকের মাঠ কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এ উদ্যোগ।

১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে সিলেটের শাল্লায় পুনর্বাসন ও ত্রাণ বিতরণের মধ্য দিয়ে ব্র্যাকের গ্রামীণ অভিজ্ঞতা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূত্রপাত। ব্র্যাক আজ পঁচিশ বছরের তারুন্য উপচেপড়া এক প্রতিষ্ঠান। এই পঁচিশ বছরে এর উন্নয়ন কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের সীমানা পেড়িয়ে ব্র্যাকের পরিচিতি বিস্তৃত হয়েছে আন্তর্জাতিক অংগনেও। এ বছরেই উদযাপিত হচ্ছে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী। ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব ফজলে হাসান আবেদ-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যই বিশ্বের বুকে ব্র্যাক একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষমতায়নের জন্য ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ১৯৮৬ সালে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। তবে ১৯৭৬ সাল থেকেই মানিকগঞ্জ এবং তারও পূর্বে সিলেটের শাল্লায় সমন্বিত প্রকল্পের আওতাধীন পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। আজ এ কর্মসূচি ২৯,৭২৭ টি গ্রামে বিস্তৃত হয়েছে এবং ১৮,০০,০০০ লোককে এর আওতায় আনা হয়েছে। এ কর্মসূচিভুক্ত জনসাধারণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা ব্র্যাকের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।

অধিকার বঞ্চিত ও আর্থিকভাবে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা যাদের কাছে স্কুলে পড়ালেখা করা স্বপ্ন মাত্র ব্র্যাক তাদের জন্য ১৯৮৫ সালে তিন বছর মেয়াদী উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (৮-১০ বছর বয়স্কদের জন্য) ও মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম (১১-১৪ বছর বয়স্কদের জন্য) চালু করেছে। বর্তমানে ৩৪,৫০০টি স্কুলের মাধ্যমে ১১,০৮,৬৮৫ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে যার ৭০% মেয়ে। এ বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য ইউনিসেফের উদ্যোগে ১৯৯৪ সালে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবিতে ব্র্যাক কাজ শুরু করে।

দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক ১৯৯১ সালে মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ১২,০৫১ টি গ্রামের এক কোটি ৫০ লক্ষ লোককে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সহযোগিতা প্রদান, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এ কর্মসূচির অন্যতম দিক। বর্তমানে ১,১৫২টি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়াও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাক দেশে ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে।

গবেষণা একটি চলমান কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্র্যাকের ওটেপ (OTEP) Oral Therapy Extension Programme বা মুখে খাওয়ার স্যালাইন শিক্ষাা কর্মসূচি তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমান। এক দশকে ব্র্যাকের স্বল্প সংখ্যক নিবেদিত স্বাস্থ্য কর্মীরা বাংলাদেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে এক কোটি ৩০ লক্ষ পরিবারকে স্যালাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে কিছু বাধা দেখা দিয়েছিল এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার পর পরই এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা হয় যার ফলে এর উপযোগিতাও বেড়ে যায়। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা কাল থেকে এই ২১ বছরে ৫৫০ টিরও অধিক গবেষণা পরিচালনা করে। এর মধ্যে সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার অনুরোধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে। ব্র্যাকের কিছু উলেøখযোগ্য গবেষণা কার্যবলী সম্পর্কে পরবর্তী নিবন্ধে বিস্তারিত জানা যাবে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলির ব্যবস্থাপনা দক্ষাতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের বিকাশের জন্য ব্র্যাক জিম্বাবুইয়ের ORAP ও যুক্তরাষ্টের School For International Training (SIT) যৌথভাবে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৯৯৪ সালে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ যতগুলো গবেষণা সম্পন্ন করেছে তা থেকে নির্বাচিত ২৭টি গবেষণা প্রতিবেদণের সার-সংক্ষেপ এ খন্ডে প্রকাশিত হল। প্রতিবেদনগুলোকে এমনভাবে বাংলায় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যাতে নির্যাস পড়তে গিয়ে কোন পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে। নির্যাস প্রকাশের পর থেকে আপনাদের অনেক পরামর্শ, সুপারিশ, মতামত ও প্রশংসা আমাদের কাছে এসেছে যা পরবর্তী প্রকাশনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের বিশ্বাস ব্র্যাক ও ব্র্যাকের কর্মকান্ড সম্পর্কে আপনাদের কিছু কিছু জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাবেন নির্যাসে। এর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হলেই সার্থক হবে আমাদের এ উদ্যোগ।

অবশেষে, যে সকল প্রতিষ্ঠান, সংগঠন কিংবা ব্যক্তির মূল্যবান পরামর্শে নির্যাস তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তারাও আমাদের ধন্যবাদ পাবার দাবীদার।

নির্যাস সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত সর্বদাই আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন।

ব্র্যাকের এ সাফল্য একদিনে অর্জিত হয়নি। দীর্ঘ ২৫ বছরে সকল নিবেদিত কর্মী, দরিদ্র জনগণ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ব্র্যাক আজ এ পর্যায়ে। ব্র্যাকের সকল উন্নয়নমূলক কর্মসূচির দিকে তাকালে বোঝাই যায়না এর যাত্রা শুরু হয়েছিল শুধুমাত্র একটি এলাকায় ত্রাণ বিতরণের মধ্য দিয়ে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের মুখে হাসি ফোটানোই হোক ব্র্যাকের এ রজত জয়ন্তীর অঙ্গীকার।

হাসান শরীফ আহমেদ

সম্পাদক

ব্র্যাক গবেষণার একুশ বছর ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

মুহাম্মদ গোলাম সাত্তার*

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্র্যাকের ২৫ বছর পূর্তি হলো। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগও একুশ পার হয়ে বাইশ বছরে পা দিতে চলেছে। এ উপলক্ষে ব্র্যাকের গবেষণা কাজের উপর কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

ব্র্যাকের বহুমুখী কর্মকান্ডের মধ্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন একটি। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দেশে ও দেশের বাইরে বিশেষ পরিচিতি লাভ করছে। ১৯৭৫ সালে মাত্র একজন কর্মী নিয়ে ব্র্যাক একটি পরিসংখ্যান ইউনিট চালু করে। ঐ কর্মীর কাজ ছিল শাল্লা এলাকায় ব্র্যকের তৎকালীন মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচির কিছু কিছু তথ্য সংকলন করা। ছোট এই ইউনিটটি অচিরেই রূপ নেয় একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে। বর্তমানে বিভাগটিতে কাজ করছেন প্রায় ১২০ জন নিয়মিত কর্মী। এদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন হচ্ছেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গবেষক, যারা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন আর্থ-সামাজিক কোন না কোন বিষয় নিয়ে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। ব্র্যাক এ কথায় শুধু বিশ্বাস রাখে তা-ই নয়, প্রচুর উৎসাহ ও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে গবেষণা কাজের জন্য। অন্যথায় এত বড় একটা বিভাগ এখানে কখনই গড়ে উঠতে পারত না। প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে গবেষণা থেকে আমরা কী সুবিধা পাচ্ছি? এখানে অল্প কথায় ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজের ক্রমবিকাশের কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। সেই সাথে গবেষণা থেকে কী সুবিধা পাওয়া গেছে তার দু-চারটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব।

উল্লেখ করা দরকার যে, ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়াই ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। তবে সরকারি ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার কর্মসূচির উপরও ব্র্যাক গবেষণা করে থাকে।

---

* ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ব্যবস্থাপক।

১৯৭৬ সালে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন ইউনিট একটি জরিপ কাজের মাধ্যমে প্রথম গবেষণামূলক কাজ শুরু করে। এটি ছিল শাল্লা প্রকল্পের একটি বেজলাইন সার্ভে বা একটি আর্থ-সামাজিক জরিপ। বিআইডিএস ও আইসিডিডিআর,বি-র সহায়তায় এ জরিপটি করা হয়েছিল। এর ফলো-আপ হিসাবে ১৯৭৬ সালে একই এলাকায় আর একটি জরিপ করা হয়। এ জরিপ থেকে আমরা ঐ এলাকায় খাবার বড়ির মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ফলাফল সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাই। এ কাজের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে বিআইডিএস-র সাথে ব্র্যাকের গবেষণা কাজের সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে ওঠে।

এ সময়ে ব্র্যাক অনুভব করে যে, গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে যে কর্মকৌশল ও জ্ঞান প্রয়োজন তার জন্য গভীরতাধর্মী গবেষণা দরকার। এ উপলব্ধি থেকে সূত্রপাত হয় এক বিশেষ ধরনের গ্রাম সমীক্ষার। শ্রীলঙ্কার নৃতত্ত্ববিদ ডঃ রঞ্জিত সেনারত্নের সহায়তায় ব্র্যাকের একদল তরুণ গবেষক বাংলাদেশের চারটি গ্রাম এলাকায় এই সমীক্ষা চালান। এ গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয় বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট*। এগুলো ব্র্যাকের নতুন উন্নয়ন কৌশল রচনায়, বিশেষতঃ শোষিত-বঞ্চিত ও দরিদ্রদের ভাগ্য পরিবর্তনে টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে , মূল্যবান পাথেয় যোগান দিয়েছিল। 'দি নেট' শীর্ষক গবেষণা রিপোর্টটির বিষয়বস্তু ইউনিয়ন পরিষদ ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে আনা হলে এক শুভ পরিবর্তন দেখা যায়। সবাই দেখতে পেলেন যে, 'ফুড ফর ওয়ার্কস'এর গম আগের চেয়ে ভালভাবে বন্টন হচ্ছে এবং তা আরো বেশি করে গরীবদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

আশি ও নব্বই-এর দশকে গবেষণা ও মূল্যায়নের কাজ আরো জোরদার এবং বহুমুখী হয়ে ওঠে। একদিকে গবেষক ও গবেষণা কর্মীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, অন্য দিকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হাতে নেয়া হয়। যেমন, ব্র্যাকের তৎকালীন চলমান ওটেপ। (Oral Therapy Extension Programme) কর্মসূচি এবং পর পর গৃহীত দু'টি বড় আকারের স্বাস্থ্য কর্মসূচির (Child Survival Programme এবং Women's Health and Development Programme) উপর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ

* প্রকাশিত রিপোর্টগুলোর নামঃ (1) Who Gets what and Why, (2) Ashram Village: An analysis of Resource Flows

ব্যাপক গবেষণা চালায়। এ সব কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে কম বেশি বিশটি গবেষণা রিপোর্ট ও পেপার প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা একটি চলমান কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্র্যাকের 'ওটেপ' তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মীরা একাদিক্রমে দশ বছর (১৯৮০-১৯৯০) কাজ চালিয়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে মহিলাদেরকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন তৈরী ও তার ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদান করেন। এই ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন ধরনের বাধা ও সমস্যা দেখা দেয় এবং উত্তরণের ভাল ভাল উপায় বেরিয়ে আসে এবং তার ফলে কর্মসূচির উপযোগিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

গবেষণা যেমন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে তেমনি গবেষণা পদ্ধতিও হয়ে থাকে বহু রকমের। উন্নতমানের গবেষণার জন্য দরকার গবেষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা। এই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের কাজটা কিন্তু সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্র্যাক বরাবরই তার কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করে এসেছে, সহায়তাও দিয়ে চলেছে। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে এক দল উৎসাহী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ গবেষক-যারা উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করছেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সত্তুর ও আশির দশকে আমরা শিক্ষার উপর তেমন কোন গবেষণা চালাতে পারিনি। তার প্রধান কারণ তখন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কুশলতার অভাব ছিল। কিন্তু নব্বই-র দশকের গোড়া থেকে আমরা শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু গবেষণা করেছি এবং এখনও করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের গবেষকগণ তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলেছেন। ফলে শুধু ব্র্যাক-ই নয়, সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং বাইরের কিছু দেশও লাভবান হতে পেরেছে। এর একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের দেশের ১১-১২ বছরের ছেলেমেয়েদের মৌলিক শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ-আলোচনা এবং সেই সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৯২ সালে এক নতুন গবেষণা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। গবেষণার বিষয়টি হচ্ছে Assessment of basic competencies (ABC) বা মৌলিক শিক্ষা যাচাই। বিষয়টি ছিল

অভিনব; বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণা আগে কখনও হয়নি। এ নতুন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ব্র্যাক গত চার বছরে পর পর অনেকগুলো গবেষণা করেছে। তা থেকে আমাদের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং ব্র্যাকের বাইরের কিছু প্রতিষ্ঠানও লাভবান হয়েছে। এ গবেষণা পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ আর একটি সমীক্ষা করেছে। কোন কোন বিদেশী সংস্থাও এটি কাজে লাগাচ্ছে। দেশের বাইরে পাকিস্তান ও নেপালে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্র্যাক আরো একটি নতুন ধরনের গবেষণা চালিয়েছে। এর নাম Standardized achievement test (SAT) বা আদর্শায়িত কৃতি অভিক্ষা। উন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বা স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান জানার জন্য SAT বা ঐ জাতীয় যাচাই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমাদের দেশে এমন কোন ব্যবস্থা নেই। স্কুলে সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সার্বিকভাবে গোটা দেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান যাচাইয়ের কোন পদ্ধতি চালু করা হয়নি। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IER) সহায়তায় SAT বা কৃতি অভিক্ষার পদ্ধতি বের করেছে এবং তা কাজে লাগিয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে এদেশে ABC এবং SAT দু'টি নব উদ্ভাবিত পদ্ধতি, যার উৎপত্তি হয়েছে ব্র্যাকের গবেষণা প্রচেষ্টা থেকে।

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সম্প্রতি আরো এক ধরনের গবেষণায় হাত দিয়েছে, যাকে বলা হয় impact assessment । এ পদ্ধতিতে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুদূরপ্রসারী ফল বা প্রভাব যাচাই করা সম্ভব হয়। মনে রাখা ভাল, কোন কর্মসূচি বা প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব যাচাই এক কথা নয়। ব্র্যাকের একটি চলমান কর্মসূচি হচ্ছে রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সংক্ষেপে আরডিপি। ১৯৯৩-১৯৯৫ সময়কালে আমরা আরডিপি-র ইম্প্যাক্ট যাচাই করি। এর ফলাফল থেকে ব্র্যাক সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ ধরনের স্টাডি ফলদায়ক এবং আরো করা দরকার। তাই ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয় বারের মত আরডিপি ইম্প্যাক্ট এ্যাসেস্‌মেন্টের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

কয়েকটি সরকারি সংস্থার অনুরোধে গত পাঁচ বছরে (১৯৯২-১৯৯৬) আমরা বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির উপর কয়েকটি গবেষণার কাজ হাতে নেই। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন দিকের উপর তিনটি জরিপ। এ গবেষণাগুলো থেকে লব্ধ তথ্য ও ফলাফল সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করেছে। যেমন পল্লী রেশনিং ব্যবস্থার মূল্যায়নের নিরীখে সরকার এই কর্মসূচিটি বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ পল্লীর দরিদ্র জনগণ এ থেকে লাভবান হতে পারেনি বললেই চলে। যমুনা সেতু প্রকল্পের জরিপ তথ্য অনুযায়ী সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করেছে। তা ছাড়া যমুনার চর ও নদীর দু-কূলে (টাংগাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলায়) বসবাসকারী বন্যা/নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা সরকার করেছে। এক্ষেত্রেও ব্র্যাকের জরিপ যোগান দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সম্পর্কে প্রামান্য তথ্য এরও আগে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের তৃণমূল পর্যায়ের কাজ কর্মের অব্যস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা সম্পন্ন করে। A Tale of Two Wings: Health and Family Planning Programmes in an Upazila in Northern Bangladesh নামে প্রকাশিত ঐ গবেষণার ফলাফল সরকারি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক ঔসুক্যের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল সম্পর্কে আমরা যে গবেষণাটি করি সেটিও সংশ্লিষ্ট মহলে প্রচুর সাড়া জাগায়।

অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত একাধিক উন্নয়ন কর্মসূচিরও মূল্যায়ন করেছে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ। মনিটরিং ও মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা হাতে কলমে শিক্ষাদান করছি বাংলাদেশের আটটি এনজিও-র কর্মীদেরকে। এখন তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসূচির মনিটরিং ও মূল্যায়ন করার অনেকটা দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। এনজিওদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ব্র্যাকের গবেষণা দিন দিন প্রসার লাভ করছে। ব্যাপ্তি ঘটছে গবেষণা কাজের। আমাদের গবেষণার বিষয়াদি এখন বহির্বিশ্বেও আলোচিত হচ্ছে। ব্র্যাকের গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে

দেশের ও বিদেশের বহু নামকরা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকবৃন্দের। এমন বহু প্রতিষ্ঠানের* সাথে আমরা যৌথভাবে একাধিক গবেষণা করেছি এবং এখনও করছি। এছাড়া দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছর ব্র্যাকে আসছেন গবেষণা-শিক্ষার্থী হিসাবে। একক অথবা ব্র্যাকের গবেষকদের সাথে একযোগে তারা গবেষণা করছেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর। শিখছেন গবেষণার কলা-কৌশল। গবেষণালব্ধ কিছু কিছু ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন জার্নালে।

উন্নয়ন কর্মকান্ডে গবেষণা যে একটি জোরালো সহায়ক শক্তি তা ফুটে উঠেছে ব্র্যাকের একুশ বছরের গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে। তাই গবেষণার ফলাফল শুধুমাত্র গবেষক ও নীতি নির্ধারকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে 'নির্যাস' নামক একটি প্রকাশনার মাধ্যমে। আমাদের বিশ্বাস, এর ফলে সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনের কাজে মাঠ কর্মীরাও গবেষণার সহায়ক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে পারবেন।

* এসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বৃটেনের ম্যানচেষ্টার ইউনিভার্সিটি , আইডিএস সাসেক্স, সিডিএস সোয়ানসী, এবং লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন; সুইডেনের ক্যারোলনিস্কা এবং উমিয়া ইউনিভার্সিটি; আমেরিকার হাভার্ড ইউনিভার্সিটি; বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত একটি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর,বি।

ব্র্যাকের পাইলট সঞ্চয় প্রকল্পের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন*

হাসান জামান, জাহেদ চৌধূরী ও নাজির চৌধূরী

পটভূমি

ব্র্যাক তার গ্রাম সংগঠন ও স্থানীয় এরিয়া অফিসের মাধ্যমে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গ্রাম সংগঠন সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে থাকে। যেহেতু প্রদত্ত ঋণ বন্ধকবিহীন আর যেহেতু ব্র্যাককে কালক্রমে স্বাবলম্বী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করাতে হবে, তাই ঋণ গ্রহীতাদের কাছে আপাত দৃষ্টিতে ঋণদান নিয়মাবলী কিছুটা হলেও কঠোর মনে হতে পারে। যেমন, ঋণ গ্রহীতাকে গ্রাম সংগঠনের সভাগুলিতে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় এবং যৎসামান্য টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখতে হয়। এ ব্যবস্থার আওতায় গ্রাম সংগঠনের সদস্য পাঁচ বৎসর পর মাত্র আংশিকভাবে তার গচ্ছিত জমা তুলে নিতে পারে।

পাইলট প্রকল্প

প্রচলিত পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ব্র্যাক গ্রামীণ সঞ্চয় উদ্যোগকে আরো গতিশীল করার জন্য এক নতুন সঞ্চয় কৌশল পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে। এই সঞ্চয় কৌশলকে 'উন্মুক্ত সঞ্চয়' ব্যবস্থা বলা যেতে পারে, যার আওতায় গ্রাম সংগঠনের সদস্যগণ স্বেচ্ছায় যে কোন সময় টাকা জমা দিতে পারে এবং তুলেও নিতে পারে।

মার্চ ১৯৯৩ এ ব্র্যাক তার ১০টি আরডিপি শাখায় সঞ্চয় হিসাবের সংশ্লিষ্ট বিধানে পরিবর্তন এনে 'উন্মুক্ত সঞ্চয় হিসাব' চালু করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের 'চলতি হিসাব' এর মত এ 'উন্মুক্ত সঞ্চয় হিসাবে ' একজন গ্রাম সংগঠন সদস্য যে কোন সময় তার সঞ্চয় তুলে নিতে পারে। বানিজ্যিক ব্যাংকের পদ্ধতির সাথে ব্র্যাক পদ্ধতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ গরমিল আছে। তা হলো ব্র্যাক তার এই উন্মুক্ত সঞ্চয় হিসাবে সকল জমার উপর ৯% হারে সুদ প্রদান করে (অবশ্য, জানুয়ারি ১৯৯৪ থেকে ৬% হারে দেয়া হয়) অন্যদিকে

---

* Summary of the RED research report entitled "Current accounts for the rural poor: a study on BRAC's pilot savings scheme" by Hasan Zaman, et.al. 1994 July. 82p. (Summarized in Bangla by Md. Azizul Hoque)

বানিজ্যিক ব্যাংক সঞ্চয় হিসাবে যেমন কম সুদ প্রদান করে, তেমনি অর্থ প্রত্যাহারের পরিমাণ এবং দফার উপরও খবরদারী করে।

এটা আশা করা হয়েছিল যে, সঞ্চয় হিসাবের নিয়ম-কানুনে উপরোক্ত পরিবর্তন আনার ফলে পল্লী সঞ্চয় আরো গতিশীল হবে এবং আরো অনেকে ব্র্যাকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে আগ্রহী হবে। যদি ফলাফল সন্তোষজনক হয়, তবে তা ব্র্যাকের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বেগবান করায় সহায়ক হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ পাইলট সঞ্চয় প্রকল্পের প্রভাব কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান সঞ্চয়ের অবস্থা, প্রশাসনিক খরচ, জমা ও টাকা তুলে নেওয়ার হার ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে এ প্রকল্প ৯% সুদ প্রদান করতে পারবে কিনা তা পরীক্ষা করাও এ গবেষণার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

পাইলট ব্রাঞ্চ ও কন্ট্রোল ব্রাঞ্চের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৬টি এরিয়া অফিস বেছে নেয়া হয়। এ ৬টি এরিয়া অফিস থেকে গড়ে ১৬/১৭ জন করে মোট ১০০ জনকে বেছে নেয়া হয়। প্রতিটি ব্রাঞ্চের দু'টি গ্রামকে বেছে নিয়ে গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও এরিয়া অফিসের ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক এমনকি প্রয়োজনে কর্মসূচি সংগঠকদের সাথেও কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরিয়া অফিসের বিভিন্ন প্রতিবেদনও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

ফলাফল

উন্মুক্ত সঞ্চয় হিসাব পদ্ধতিতে গ্রামীণ জনগণ তাদের প্রয়োজনে টাকা তুলতে কিংবা জমা দিতে পারে। দেখা গেছে, সঞ্চয়ে এর ইতিবাচক একটি প্রভাব রয়েছে। ব্র্যাকের ৬টি এরিয়া অফিসে (শাহরাস্তি, পবা, ফরিদপুর, হবিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও মাধবদি) পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মাথাপিছু গড় নিজ মাসিক সঞ্চয়ের পরিমান ১৭ টাকা যা কন্ট্রোল ব্রাঞ্চে ১৪ টাকা। অধিকন্তু, পাইলট ব্রাঞ্চগুলিতে গড় মোট জমা টাকার পরিমাণ ৮০,৩৫০ টাকা যা কন্ট্রোল ব্রাঞ্চে ৪৬,৯৬৭ টাকা। মোট কথা, সঞ্চয়ে পাইলট ব্রাঞ্চ কন্ট্রোল ব্রাঞ্চ এর চেয়ে অধিক ফলপ্রদ। অর্থাৎ বলা যায় যে, উন্মুক্ত সঞ্চয় হিসাব পদ্ধতি অনুসরণে গ্রাম সংগঠনগুলির সদস্যবৃন্দ সঞ্চয়ে বেশি উৎসাহিত হয়েছে। এজন্য ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন সদস্যদেরও পল্লীবাসীদের আস্থা বেড়ে গেছে। কারণ এখন তারা এই পদ্ধতির আওতায় প্রয়োজনের সময় সঞ্চিত অর্থ তুলতে পারে।

অসুখ বিসুখের সময় সাধারণত গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণী সঞ্চিত অর্থ তুলে নেয়। পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের জন্য পুরাতন ব্রাঞ্চগুলিতে প্রায় ১৫% এবং নতুন ব্রাঞ্চগুলিতে আরও কম অর্থ তোলা হয়।

দেখা গেছে, এ সঞ্চয় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন, ফরিদপুর অফিস থেকে গ্রামীণ জনগণ শুধুমাত্র মাসে প্রথম দুই সপ্তাহে টাকা তুলতে পারে। আবার দেখা গেছে, মানিকগঞ্জ ব্রাঞ্চে সদস্যরা একবার টাকা তুলতে আবার ঐ পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ব্যালেন্স পূর্বের সমান না করা পর্যন্ত তাকে আর টাকা তুলতে দেয়া হয় না।

দেখা গেছে যে, সব ব্রাঞ্চে ঋণের দায়ভার বেশি সে সকল ব্রাঞ্চে কম পরিমাণ টাকা তুলে নিতে অনুমতি দেয়। আবার সদস্যদেরকে তাদের পুরো টাকাটাই তুলতে দেয়া হয় না যাতে তাদের ন্যূনতম ব্যালেন্সটি থেকে যায়।

পাইলট প্রকল্পটির বাস্তাবায়নে যে বাড়তি স্টেশনারীর ব্যবহার করা হয়, তার খরচ বর্তমানে ব্রাঞ্চের ওয়ার্ক লোডের তুলনায় যৎসামান্যই মনে হয়। অবশ্য, প্রকল্পটি যদি অভীষ্ট পথে আরো গতিময় হয়ে ওঠে এবং সঞ্চয় হার ক্রমশঃই বেড়ে যায়, বাড়তি স্টেশনারী এবং বাড়তি স্টাফ নিয়োগের খরচাদি তখন খতিয়ে দেখতে হেব।

যা হোক, যে সব ব্রাঞ্চে এ নতুন সঞ্চয় উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে কার্য প্রণালী সহজতর ও মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সদস্যদের পাশ বুকে সঞ্চয় প্রত্যাহারের ব্যাপারটির যথাযথ সংস্থান করতে হবে।

লক্ষীভূত জনগোষ্ঠীর চাওয়া-পাওয়া, দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থানগত পরিবেশ প্রভৃতি পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ব্র্যাকের ব্রাঞ্চ স্টাফদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা মৌল পরিবর্তন আনা দরকার। জনগোষ্ঠীকে শুধু দানগ্রহীতা বা সুবিধাভোগী বিবেচনা না করে সম্ভাব্য গ্রাহক বা মক্কেল হিসাবেও বিবেচনা করা সমীচীন। গ্রাহক সেবার মান বাড়ালে সঞ্চয় অনেক বৃদ্ধি পাবে।

উন্মুক্ত সঞ্চয় স্কীমে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাইরে অপেক্ষকৃত সচ্ছল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্ভাব্য জমাদানকারী হিসাবে সম্পৃক্ত করা সমীচীন। এতে ব্র্যাকের সঞ্চয় এবং কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাবে।

উন্মুক্ত সঞ্চয় হিসাবের পাশাপাশি একটি পৃথক মেয়াদী জমা হিসাব রাখার ব্যবস্থা করা হলে বিনিয়োগের জন্য ব্র্যাকের হাতে বেশি অর্থ থাকবে। জানুয়ারি ১৯৯৪ থেকে সঞ্চয়ের উপর যে নতুন ৬% হারে সুদ প্রদান করা হচ্ছে, ব্র্যাক সেই সুদের হার আরো কমাবার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এ জরিপে সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, যেখানে অন্য সব সঞ্চয় ব্যবস্থায় পাঁচ বছর পর অর্থ তোলা যায়, সে ক্ষেত্রে উন্মুক্ত সঞ্চয় হিসাব ব্যবস্থায় যদি জমার উপর ব্র্যাক অপেক্ষাকৃত কম সুদও দেয়, তাও অধিকতর কাম্য।

উপসংহার

এ গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে জমা হিসাব ব্যবস্থা চালু আছে, তার স্থলে 'চলতি হিসাব' ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু করা উচিত। সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্র্যাকের এমন উদ্যোগ লাভও মঙ্গলজনক, বিনিয়োগমুখী এবং স্বাবলম্বী হিসাবে দিক নির্দেশনার কাজ করতে পারে।

গ্রামীণ জনগণের সমস্যা মোকাবেলা ও বেঁচে থাকার কৌশল*

মনিরুল ইসলাম খান ও এম করিমুল হক

গ্রামীণ বাংলাদেশে দারিদ্র্য এখনো একটি বড় সমস্যা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের খাবার, চিকিৎসা, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়নি। শিক্ষার অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। এ গবেষণায় ব্র্যাকের ভিলেজ ষ্টাডি প্রজেক্ট-এর (ভিএসপি) অধীনে গ্রামীণ জীবনের কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় যেমন জমির মালিকানার ধরণ, পেশা, শিক্ষা ও আয়ের উৎস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের উপলব্ধি থেকে সমস্যার প্রকৃতি খুঁজে বের করা। কারণ গ্রামের মানুষ প্রতিদিন যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলো সমাধানের উপায় তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব দেখার জন্য জামালপুর ও যশোর জেলায় ব্র্যাকের কর্মসূচিভুক্ত এবং বহির্ভূত গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রায় ২০০টি বিষয়ে গ্রামবাসীদের বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করা হয়েছে তাদের সমস্যা সম্পর্কে এবং কিভাবে তারা এর মোকাবেলা করে তা জানার জন্য।

জামালপুর জেলার সোনাকাটা, দেলুয়াবাড়ি ও মানিকবাড়ি গ্রামে এবং যশোর জেলার সুবলকাঠি, তাহেরপুর ও জুরানপুর গ্রামে সমীক্ষাটি চালানো হয়েছে।

ফলাফল

ব্র্যাক প্রকল্পের আওতাভুক্ত এবং বহির্ভূত সব গ্রামেই জমির মালিকানা নির্দিষ্ট কোন আকার মানেনা। তবে এখনো ধনীদের হাতেই বেশি জমি কেন্দ্রীভুত হয়ে আছে এবং প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বেশি।

---

* Summary of the RED research report entitled "Problems, supports, and survival strategies among the rural households of Bangladesh'' by MI Khan and MK Hoque. 1994 June. 33p. (Summarized in Bangla by Shahana Huda)

সাধারণত যার এক একরেরও কম জমি আছে তাকেই প্রান্তিক চাষী বলে। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশেরই নিজের জমি নাই অন্যের জমি চাষ করে খায় বা নিজেদের শ্রম বিক্রি করে। প্রতিটি গ্রামেই অর্ধেকেরও বেশি খানার মানুষ দিনমজুরি করে। সব গ্রামেই নিরক্ষরতার হার খুব বেশি। বিশেষ করে যশোরে ব্র্যাকের কর্মসূচির অধীন দু'টি গ্রামে নিরক্ষতার হার খুব বেশি। অনেক পরিবারের প্রধানদের মাধ্যমিক শিক্ষার পর আর কোন শিক্ষা লাভ হয় নাই। তবে কিছু পরিবারের কর্তা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত। কৃষি কাজের বাইরে পেশার বিভিন্নতা না থাকলেও, প্রকল্পভুক্ত ও বহির্ভূত সব গ্রামেই স্বল্প সংখ্যক লোক ক্ষুদ্র ব্যবসা, ঠেলা গাড়ী চালনা, মাছ ধরা, কুটির শিল্প, ভিক্ষাবৃত্তিসহ অন্যান্য কাজের সঙ্গে জড়িত।

গ্রামের মানুষকে প্রশ্ন করে বেশ কিছু সমস্যার কথা জানা গেছে, যা তারা নিয়ত অনুভব করছে। গ্রামবাসীরা ৩০ টি প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- খাবার, কাজ, কাপড়, ব্যবসার পুঁজি, বাড়িঘর তৈরি ইত্যাদির জন্য টাকার অভাব, বাসস্থানের স্বল্প জায়গা, অপ্রতুল গবাদি পশু, জমিবন্ধকী ও নলকুপের অভাব। দেখা গেছে, গ্রামবাসীদের সব সমস্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। তবে বিয়ে কেন্দ্রিক সমস্যা যেমন যৌতুক, তালাক, স্ত্রী নির্যাতন, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি কর্মসূচির আওতাভুক্ত গ্রামে বেশি। গ্রামবাসীরা সাংসারিক এই সমস্যার চেয়ে অর্থের অভাবটাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

গ্রামবাসীরা বিভিন্ন উপায়ে প্রথমে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটানোর চেষ্টা করে। এরমধ্যে সনাতনী ও আধুনিক দুই ধরণের উপায়েই তারা নির্ভর করে অভাব মেটানোর জন্য। বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা ও ঋণ তারা যেমন নিচ্ছে তেমনি তারা আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি ও মহাজনদের কাছ থেকেও ঋণ নেয়। নিজেদের জমির ফসল বিক্রি করে, শ্রম বিক্রি করে, এবং নিজেদের সঞ্চয় ও লভ্যাংশ, সন্তান ও স্ত্রীর আয় এবং সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় কাজে লাগিয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় একটি পরিবার বিভিন্ন উৎস থেকে সাহায্য নিচ্ছে। কারণ, কোন নির্দিষ্ট একটি উৎস থেকে সাহায্য নিলে সেটা পর্যাপ্ত হয়না। আবার এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, গ্রামবাসীরা ইচ্ছে করলে একসঙ্গে কয়েকটি উৎস থেকে ঋণ পেতে পারে। ব্র্যাকের কর্মসূচিভুক্ত এবং কর্মসূচি বহির্ভূত দু'ধরনের গ্রামেই ফসল বিক্রি ও দিনমজুরি করার ব্যাপারে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। কর্মসূচি বহির্ভূত গ্রামের লোকেরা ধনী মহাজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে

বেশি ঋণ নেয়। যশোরের চেয়ে জামালপুরে বেসরকারি সংস্থাসমূহের আর্থিক সহযোগিতা বেশি দেখা গেছে। যশোরে ব্র্যাক প্রকল্পের বাইরে যেসব গ্রাম রয়েছে সেখানে দরিদ্র লোকেরা প্রতিবেশীর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য পায় এবং একারণেই সামাজিকভাবে নিরাপদ বোধ করে।

উপসংহার

এ গবেষণায় দেখা গেছে, সনাতনী উৎস যেমন প্রতিবেশী বা মহাজনদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া সবসময় ইতিবাচক নয়। উন্নয়ন সংস্থাগুলো যে সাহায্য দেবে তার পাশাপাশি গ্রামের বিভিন্ন উৎসগুলো অবশ্যই চালু থাকতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকাকে কোনো ভাবেই খাটো করে দেখা যায় না।

মতলব থানায় ব্র্যাকের দু'টি স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা*

সাবিনা রশিদ ও এ এম আর চৌধুরী

ব্র্যাক ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। মাত্র ২২টি স্কুলে নিয়ে যাত্রা শুরু করে ১৯93-এ স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২ হাজার ছয়শতে। ব্র্যাক ৮-১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য তিন বছর মেয়াদী উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য দুই বছর মেয়াদী কিশোর কিশোরীদের প্রাথমিক শিক্ষা (পিইওসি) এই দুই ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাক স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে ঐ এলাকার সাধিত পরিবর্তন দেখা, ব্র্যাক স্কুল, স্কুলের শিক্ষক ও অত্র এলাকার জনগণের সাথে সম্পর্ক কিরূপ ও এ স্কুলের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করা। এছাড়াও, এ স্কুল দু'টি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিভাবে শিক্ষক সংগ্রহ করা হয়, এ স্কুলের সাথে সমাজের জনগণ কিভাবে জড়িত, স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ ও এ দু'টি স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি তুলনা করা এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এ সমীক্ষার জন্য বিভিন্ন স্তরের জনগণ, শিক্ষক, অভিভাবক ও কর্মসূচি সংগঠকদের সাথে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দু'জন বাড়ির মালিক যারা ব্র্যাক স্কুলের জন্য তাদের বাড়ি ভাড়া দিয়েছে তাদেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও শিক্ষকদের কাছ থেকে স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পুরনো তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গ্রামীণ শিক্ষকদের জন্য প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত রিফ্রেশার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

---

* Summary of the RED research report "entitled" An inside Case at two BRAC Schools in Matlab thana" by Sabina Rashid and AMR Chowdhury. 1994 July. 55p. (Summarized in Bangla by Shahana Huda)

গ্রামীণ স্কুলের বিভিন্ন কেস্ ষ্টাডি অধ্যয়ন ও গ্রামীণ স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লিখিত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ফলাফল

মতল এলাকার সমীক্ষাধীন দুটি স্কুলকে ক এবং খ নামে চিহ্নিত করা হয়। সমীক্ষায় সরকার বাড়ির হাজেরার স্কুলকে 'ক' এবং পাটোয়ারী বাড়ির স্কুলকে 'খ' ধরা হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় স্কুল খ ছিল আর্থিকভাবে দুর্বল, ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মাদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হতো না। ফলে তারা সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিল না। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের বাবা-মা ও ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠকদের মধ্যে তেমন একটা যোগাযোগও ছিল না।

এছাড়া কর্মসূচি সংগঠকদের খুব দ্রুত বদলি করা হতো বলে তাদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাদের সঙ্গে প্রধান কার্যালয়ের যোগাযোগও ভাল ছিল না। শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় ছিলনা এবং তারা শিশুদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো না ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ স্কুল 'ক' এ পড়ানোর পদ্ধতি অধিকতর ভাল ছিল। স্কুল 'খ' এ পড়ালেখা ছেড়ে চলে যাওয়ার হার খুব বেড়ে যাওয়ায় স্কুল ক থেকে ছাত্র-ছাত্রী এনে এ স্কুলে ভর্তি করা হয়। ফলে স্কুল খ পিছিয়ে পড়ে। ব্র্যাকের স্কুল শিশুদের খৃষ্টান করে দিচ্ছে গ্রামের ধর্মীয় নেতারা এ ধরণের গুজব ছাড়িয়ে দেয়। অথচ কর্মসূচি সংগঠক ব্র্যাক স্কুলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেনি।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, ব্র্যাক সাধারণত কোন এলাকার স্কুল শুরুর আগে ঐ গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানিয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে। এরপরে শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা, শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা কত এবং স্কুলের জন্য বাড়ি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়। শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবাহিতা মহিলাদের প্রাধান্য দেয়া হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় এলাকাবাসীদের সহযোগিতা অথবা বিরোধিতা, স্কুলের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের সম্পর্ক, স্থানীয় নেতাদের সমর্থন, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান, অভিভাবক শিক্ষক নিয়মিত বৈঠক ইত্যাদি স্কুলের মান উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এছাড়া এলাকাবাসীদের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন দলাদলি ও দ্বন্দ্ব স্কুলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সুপারিশমালা

- কাজের চাপ, বদলী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যাতে আলোচনা করা যায় এজন্য মাঠ কর্মী ও প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকা আবশ্যক।
- মাঠ পর্যায়ে আরো পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।
- কর্মসূচি সংগঠকদের বার বার দৈব বদলি না করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বদলির পদ্ধতি প্রচলন করা প্রয়োজন।
- শিক্ষক ও কর্মসূচি সংগঠকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার যাতে তারা জনগণের অংশগ্রহণ ও অভিভাবক শিক্ষকের সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে পারে।
- শিক্ষক কিংবা কর্মসূচি সংগঠক অভিভাবকদের সভায় যোগদানের জন্য উৎসাহিত করতে তাদের ছবি কিংবা নাম ব্র্যাকের গণকেন্দ্র পত্রিকায় ছাপা যেতে পারে।
- শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক একজন ছাত্রকে প্রতিনিধি বানাতে পারে।

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে নগদ অর্থ উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা যায়। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক অত্র এলাকার অন্যান্য শিক্ষকদের রিফ্রেসার্স কোর্স প্রদানের সময় কর্মসূচি সংগঠকদের সাহায্য করতে পারে। খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে গুজব বন্ধ করার জন্য কিছু ধর্মীয় পড়াশুনা চালু করা যেতে পারে। স্কুলে প্রতিদিন জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হলে জনগণ বুঝতে পারবে যে, ব্র্যাক একটি দেশীয় সংগঠন।

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার উপর একটি সমীক্ষা*

সমীর রঞ্জন নাথ, মোঃ কায়সার আলী খান ও এ এম আর চৌধুরী

অক্ষরজ্ঞান দান ও প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান যে কোন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি মূখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্‌উদ্দেশ্যে ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে একটি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। যে সকল খানার ছেলে-মেয়েরা দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্র্যাক তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই কার্যক্রমে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং অধিকাংশ স্কুলই গ্রামীণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। ব্র্যাক তিন বছর ব্যাপী দুই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। ৮-১০ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) এবং ১১-১৬ বছর বয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা (পিইওসি) কার্যক্রম চালু করে।

ব্র্যাক স্কুলের পড়ালেখা শেষ করেও তাদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে। দেখা গেছে, ১৯৮৯ সালে ব্র্যাক স্কুলের পড়াশুনা শেষ করা ছাত্র-ছাত্রীদের ৪৪%, ১৯৯১ সালে আনুষ্ঠানিক স্কুলে তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাক স্কুলের পড়ালেখা শেষ করা ছেলে-মেয়েদের মৌলিক শিক্ষার মান ও যোগ্যতা নিরূপণের জন্য এ গবেষণা হাতে নেয়া হয়। এদের মধ্যে কত জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাক্রম শেষ হওয়ার পূর্বেই আনুষ্ঠানিক স্কুল থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দেয় তাও এ গবেষণায় দেখা হয়।

---

* Summary of the RED research report entitled "Progress in basic competencies of NFPE and PEOC graduates over time" by SR Nath, Md Kaisar Ali Khan and AMR Chowdhury. 1994 July. 29p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দুই দফায় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। প্রথম দফায় ১৯৯০-এ পিওওসি ও এনএফপিই স্কুলের মেয়াদ শেষ করেছে ১৯৯২-এ তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এনএফপিই স্কুলের ৫০ জন মেয়ে ও ৫০ জন ছেলে এবং পিইওসি স্কুলের ৫০ জন মেয়ে এবং ৫০ জন ছেলে, মোট ২০০ জনকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমান সমীক্ষায় তাদের মধ্যে থেকেও ১৬৯ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এদের মধ্যে এনএফপিই স্কুলের ৪৩ জন মেয়ে ও ৪৩ জন ছেলে, পিইওসি স্কুলের ৪৩ জন ছেলে ও ৫০ জন মেয়ে। দ্বিতীয় দফায় ১৯৯২-এ এনএফপিই ও পিইওসি স্কুলের মেয়াদ শেষ করেছে তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ১৯৯২-এ ১২ টি এলাকায় ব্র্যাক পরিচালিত ৪৭০ টি এনএফপিই স্কুল ও ২৬২টি পিইওসি স্কুলের মেয়াদ শেষ হয়। এনএফপিই ও পিইওসি স্কুল রয়েছে এমন ১২টি এলাকা থেকে ৫টি এলাকা বাছাই করা হয়। প্রতিটি এলাকা থেকে ২টি এনএফপিই ও ২টি পিইওসি স্কুল অর্থাৎ ১০টি এনএএফপিই ও ১০ টিপিইওসি স্কুল বাছাই করা হয়। প্রতিটি স্কুল থেকে ৫ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়ে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করে মোট ২০০ ছেলে-মেয়ের উপর এ গবেষণাটি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মৌলিক শিক্ষা বলতে সে ধরনের শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে যা একজনকে লিখতে, পড়তে এবং সাধারণ হিসাব কষতে শেখায় এবং তাদের জীবনের মানন্নোয়নে প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান প্রদান করে। এ গবেষণায় জীবন দক্ষতা সম্পর্কিত ১০টি প্রশ্নের মধ্যে ৭টির সঠিক উত্তর, অনুচ্ছেদের ৪ টি প্রশ্নের ৩ টির সঠিক উত্তর, চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগের যোগ্যতা ও চারটি গাণিতিক প্রশ্নের তিনটির সঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে সর্বনিব পর্যায়ের যোগ্যতা হিসাবে ধরা হয়েছে।

ফলাফল

এ সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৯০ সালে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী ছেলে-মেয়েদের দুই-তৃতীয়াংশ আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ১৯৯২ সালে ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তকারীদের উপর ১৯৯৪ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, তখন মাত্র ৫৮.৫%

ছাত্র-ছাত্রী তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যারা আর পড়ালেখা করেনা তাদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যাই বেশি। সমীক্ষায় দেখা যায়, ছেলেদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেশ (২২%) হ্রাস পেয়েছে এবং মেয়েদের ভর্তির হার কিছুটা (৭%) বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা গেছে, এনএফপিই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৫% পড়ালেখা চালিয়ে যায় না এবং পিইওসি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির হারে হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি নেই। তবে ১৯৯০ সালের তুলনায় ১৯৯২ সালে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ১৯৯২ সালের তুলনায় ১৯৯৪ সালে এ হার হ্রাস পেয়েছে।

পিইওসি থেকে পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে এনএফপিই ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেশি। তবে কিছু ছাত্র-ছাত্রী যারা ১৯৯২ সালে ভর্তি হয়নি তারা আবার ১৯৯৪ সালে ভর্তি হয়েছে।

১৯৯২ সালে সমীক্ষাধীন ১৬৯ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৬.২% ছাত্র-ছাত্রী মৌলিক শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে এবং ৫৯.১% অক্ষরজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। এ ক্ষেত্রে এনএফপিই থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা পিইওসি ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বেশি ভালো করতে পেরেছে। এনএফপিই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ছেলেরা বেশি ভাল করেছে। কিন্তু পিইওসি স্কুলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মৌলিক শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ছেলেরাই ভাল করেছে।

পুনরায় ১৯৯৪ সালে এ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। দেখা গেছে, তাদের যোগ্যতা ও অক্ষরজ্ঞান অর্জনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেছে এমন শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯.২%-এ দাড়িয়েছে। অক্ষরজ্ঞান অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.২%-এ দাড়িয়েছে। উল্লেখ্য যে, মৌলিক শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এনএফপিই এবং পিইওসি-র মেয়াদ সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছেলেদের কৃতিত্ব অনেক বেশি। মৌলিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ১৯৯০ সালে পড়ালেখা সমাপ্তকারীদের উপর ১৯৯২ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২৫.৪% এর মৌলিক যোগ্যতা নেই আবার ১৯৯৪ সালের জরিপে দেখা গেছে, ১৮.৩% এর নেই। পক্ষান্তরে ১৯৯৩ সালে ৫.৩% শিক্ষার্থীর মৌলিক যোগ্যতা ছিল কিন্তু ১৯৯৪ সালে দেখা গেছে, তাদের মৌলিক যোগ্যতা নেই। সমীক্ষায় দেখা যায়, ব্র্যাকের সকল স্কুলেই সার্বিক যোগ্যতার স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গণনার ক্ষেত্রে সফলতা বেশি

লক্ষ্য করা যায়। এখানে এনএফপিই ও পিইওসি এ দুই স্কুলেরই ছাত্রীদের অবস্থা ভাল। অপর এক এলাকায় লিখন দক্ষতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কৃতিত্ব বেশি।

আলোচনা ও উপসংহার

ব্র্যাকের এনএফপিই ও পিইওসি স্কুল থেকে প্রতি বছর প্রচুর ছেলে-মেয়ে পড়ালেখা শিখে বের হয়। ১৯৯০ সালে পাশ করা ২০০ ছেলে-মেয়ের উপর ১৯৯২ সালে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ১৯৯৪ সালে তাদের মধ্য থেকে ১৬৯ জনের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী গণনার ক্ষেত্রে, তারপরে জীবন দক্ষতা, তারপরে পড়া ও সবশেষে লিখন দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে।

লক্ষ্যণীয় যে, সাতজন ছেলে-মেয়ে ১৯৯২ সালে মৌলিক শিক্ষার দক্ষতা দেখাতে পারেনি, কিন্তু ১৯৯৪ সালে দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। এদের মধ্যে দুই জন এনএফপিই স্কুলের মেয়ে এবং বাকীরা পিইওসি স্কুলের তিন জন ছেলে ও দুই জন মেয়ে।

আবার দেখা গেছে, ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের পড়ালেখা শেষ হওয়ার চার বছরের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা ভুলে গেছে। এর মধ্যে এনএফপিই স্কুলের এক জন ছেলে, ৩ জন মেয়ে। পিইওসি-র ২ জন ছেলে ও ৩ জন মেয়ে।

সার্বিকভাবে ব্র্যাক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা গেছে, ১৯৯২ সালে এ হার ছিল ৫৮% কিন্তু ১৯৯৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩% এ দাঁড়ায়। এ সফলতা পিইওসি স্কুলের মেয়েদের বেলায় বেশি লক্ষণীয়।

মোরগ-মুরগী পালনে ভূমিহীন দরিদ্র নারী সমাজঃ পাঁচটি গ্রামের চিত্র*

মোঃ নূরুল আমিন

ভূমিকা

গ্রামীণ ভূমিহীনদের বিশেষ করে অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির প্রয়াসে ব্র্যাকের পোলট্রি কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম শুরু করা হয় ১৯৭৯ সালে মানিকগঞ্জে। ১৯৮৩ সালে কতিপয় সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় ব্র্যাক পোলট্রি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে ভূমিহীনদের বিশেষ করে মহিলাদের) আয় বাড়ানো, মোরগ-মুরগীর মৃত্যু হার কমানো ও এর সংখ্যা বাড়ানো এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ানো। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ হচ্ছেঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পোলট্রি কর্মী দল গঠন, নিয়মিত টিকাদান, এক দিনের বাচ্চা পালন ইউনিট প্রতিষ্ঠা, মুখ্য মুরগী পালক দল তৈরী, মুরগীর খাবার বিক্রয়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ডিম সংগ্রহকরণ, ঋণ প্রদান এবং কর্মসূচির নিয়মিত তদারকি।

গ্রামাঞ্চলে মোরগ-মুরগী পালন ও খবরদারী বাড়ির মহিলাদেরই এখতিয়ারে এবং এগুলির মালিকানাও তাদের। বাচ্চা ফুটানো, খুদ-কুড়া খাওয়ানো, ডিম বা মুরগী বিক্রি করা সবই ঘরের মেয়েরা করে থাকে। প্রচলিত দেশী পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নততর আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগী পালন করলে এখাত থেকে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের মাসিক আয় সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্র্যাকের পোলট্রি কর্মসূচি পরিচালনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হলো গ্রাম পর্যায়ে মুখ্য মুরগী পালকদের সংগঠিত করা, যারা কর্মসূচির আদর্শাবলী বাস্তবায়নে সক্রিয় হবে এবং গ্রাম পর্যায়ে অন্যান্যদেরকেও উন্নত জাতের মোরগ-মুরগী পালনে উদ্বুদ্ধ করবে।

দরিদ্র ও উৎসাহী মহিলাদেরকে পোলট্রি পালন সংক্রান্ত আদর্শ ব্যবস্থাদি বিষয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে মুখ্য মুরগীপালক হিসাবে গড়ে তোলা হয়। তবে মুখ্য পালক হওয়ার তিনটি পূর্বশর্ত হলো, তার (১)

---

* Summary of the RED research report entitled “Poultry rearing by rural women: cases from five villages” by Md. Nurul Amin. 1994 October. 31p. (Summarized in Bangla by Md. Azizul Hoque)

একটা সঙ্কর মোরগ থাকতে হবে, (২) দশটি মুরগী থাকতে হবে যার মধ্যে অন্তত পাঁচটি উন্নত জাতের, এবং (৩) মুরগী রাখার উপযুক্ত ঘর বা খোপ থাকতে হবে।

উদ্দেশ্য

গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা উন্নত জাতের মোরগ-মুরগী কিভাবে, কতটি করে, কী অবস্থায় পালন করছে, এবং তার আয়-ব্যয়ে মহিলারা উৎসাহিত হচ্ছে কিনা, মুরগী পালনের পথে প্রতিবন্ধকতা কী কী এসব তথ্যাদি জানার উদ্দেশ্যেই এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়েছে। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ সমীক্ষাটি ১৯৯৩- এর সেপ্টেম্বর মাসে পরিচালনা করে।

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন ৫টি গ্রাম থেকে ১০৪ জন সক্রিয় মুখ্য মুরগী পালককে সমীক্ষার জন্য বেছে নেয়া হয়। এর সবাই ব্র্যাকের পোলট্রি কর্মসূচির রেজিস্ট্রিকৃত মুখ্য মুরগী পালক। উত্তরদাতাদের মতে সমীক্ষাটি মন্দা সময়ে চালানো হয়েছে, অর্থাৎ বছরের যে সময়ে দরিদ্র মহিলাদের কাছে সবচেয়ে কম মোরগ-মুরগী থাকে। ফলে বলা বাহুল্য, এই সমীক্ষার পর্যালোচনা, ফলাফল বিশেষ সতর্কতার সাথে বিবেচ্য।

ফলাফল

সমীক্ষা পরিচালনার সময়ে নমুনাভুক্ত ১০৪ জন মূখ্য পালকের কাছে সর্বমোট ৭১০ টি মোরগ-মুরগী ছিল। যেখানে প্রত্যেক মুখ্য পালকের ১০ টি করে মুরগী থাকার কথা সেখানে ১৬% উত্তরদাতার বাড়িতে কোন মোরগ-মুরগীই ছিল না।

দেখা গেছে, গ্রামীণ মহিলারাই কার্যত ঘরের হাঁস-মুরগীর মালিক। উত্তরদাতা মহিলারা বাড়ির মোট মোরগ-মুরগীর ৮৯%-এর মালিক, আর ৫%-এর মালিক ঘরের মেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য মহিলা

সদস্যগণ। আবার ৬% উত্তরদাতা জানিয়েছে যে, মোরগ-মুরগী বাড়ির পরিবারের যৌথ মালিকানার ব্যাপার। মোরগ-মুরগীর মালিকানায় এককভাবে বাড়ির পুরুষদের অংশ নেই।
যদি ও প্রায় ৮৭.৫% পালকই তাদের মুরগীর জন্য ঘর/খোপের ব্যবস্থা রাখে, বেশিরভাগ বাসস্থানের অবস্থাই অস্বাস্থ্যকর। অন্যদিকে ১২% পালকেরই বাড়িতে মুরগীর কোন ঘর নাই।

গবেষণাধীন লোকজন প্রধানতঃ তাদের শোবার ঘরে বা রান্না ঘরের উঁচু ভিটির নিচে একটা বড় গর্তাকৃতি স্থানকে মোরগ-মুরগীর ঘর হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের (৪৩%) ঘরে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা খুবই খারাপ। শতকরা ২৮ ভাগ ঘর আবার বাঁশের তৈরী, ১৮% ঘর উপরে টিনসহ কাঠ দিয়ে আর ১১% ঘর মাটি বা ইট দিয়ে তৈরী। দেখা গেছে, মাটির গর্তে থাকা উচ্চ জাতের মুরগীর মৃত্যু হার ৩৭% (সর্বোচ্চ) আর কাঠের তৈরী ঘরে ২৩% (সর্বনিম্ন)।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুরগী পালকেরা খাদ্য শস্যের উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্ট আহার্য, চাল-গমের খুদ-কুড়া, এবং ঘর-বাড়ির অন্যান্য আবর্জনা তাদের দেশী আর উন্নত জাতের মুরগীদের খেতে দেয়। কেবল ৩ জন উত্তরদাতা বলেছে যে, মোরগ-মুরগীর জন্য কুড়া প্রভৃতির সাথে সুষম খাবারেরও ব্যবস্থা করে।

মুরগী প্রতি মাসিক খাবার বাবৎ ৮.৫০ টাকা নগদ খরচ হয়। এটা গৃহস্থালীর খুদ-কুড়া ও আবর্জনার মোটামুটি দাম ধরে হিসাব করা হয়েছে। দেখা গেছে, যাদের মুরগীর সংখ্যা বেশি, তাদের মুরগীর খাবার খরচ তুলনামূলকভাবে কম। যাদের মুরগী ২০ এর বেশি, তাদের মাসিক মুরগী প্রতি খরচ ৬ টাকা, আর যাদের অনধিক ৫ টা মুরগী তাদের মুরগী প্রতি খরচ ১৩ টাকা।

মুরগী পালকেরা প্রাপ্ত ডিমের ৫০% বিক্রি করে দেয়, ৩৩% নিজেরা খায়, ৭% রাখে বাচ্চা ফুটানোর জন্য এবং বাকি ডিম খরচ করে বিবিধ প্রয়োজনে। সাধারণত ফেরীওয়ালাদের কাছে ডিম বিক্রি করা হয়, আবার কখনো কখনো স্থানীয় বাজারেও তা বিক্রি হয়। অনেক সময় ব্র্যাকের কর্মীরা পালকদের বাড়ি থেকে ডিম সংগ্রহ করে।

মোরগ-মুরগী আর ডিম বিক্রয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক বা আকস্মিকভাবে হয়ে থাকে। কোন কোন সময় যেমন ফসল তোলার পূর্বে, যখন কাজ মেলেনা, কিংবা বর্ষাকাল অথবা যখন পশুপাখীর মড়ক লাগে তখন বাধ্য হয়েই গ্রামের মানুষ মোরগ-মুরগী বিক্রি করে দেয়। মহিলারাই সাধারণত মুরগী বিক্রির অর্থ খরচ করে থাকে। এসব অর্থ খরচ করা হয় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, ঋণ পরিশোধ, চিকিৎসা, কাপড়-চোপড় ক্রয়, ইত্যাদি খাতে। দেখা যায় যে, ১৯ জন উত্তরদাতা মুরগী/ডিম বিক্রয়লব্ধ সঞ্চিত অর্থে সময় সুযোগ মতো ছাগল, গরু, জমি, বাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি কিছু স্থায়ী সম্পদের সংস্থানও করতে পেরেছ।

দেখা গেছে, মুরগীর মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্নয় করতে এবং প্রাথমিক নিরাময় ব্যবস্থা নিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুরগী পালনকারীরা অক্ষম। শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশি উত্তরদাতা জানায় যে, তারা মোরগ-মুরগীর টিকাদান করে থাকে তবে তা অনিয়মিত। কারণ, টিকাদান নির্ভর করে টিকা প্রদানকারীদের গ্রাম পরিদর্শনে আসার উপর। টিকা প্রদানকারীরা সাধারণত তখনই গ্রাম পরিদর্শনে আসে যখন কারও মুরগীর খামারে মড়ক দেখা দেয়। টিকাদানকারীর অনিয়মিত গ্রাম পরিদর্শন এবং টিকার মান ও গুণ সম্পর্কেও অভিযোগ শোনা গেছে।

উন্নত জাতের মোরগ-মুরগী পালনের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুরগী পালনকারীরা বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয় না। যদিও পোলট্রি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণকালে দৈনিক একবার মুরগীর ঘর পরিস্কার করার প্রতি জোর দেয়া হয়, কিন্তু বাস্তবে প্রতি সপ্তাহেও তা পরিস্কার করা হয় না।

হাঁস-মুরগী গরু-মহিষের জন্য ব্রাঞ্চ পর্যায়ে মাত্র একজন করে কর্মসূচি সহকারী নিয়োজিত থাকে। অর্পিত দায়িত্বাবলী সুচারুভাবে নিয়মিত দেখাশুনা করা এই একজন সহকারীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হয়। (সম্প্রতি অবশ্য ব্রাঞ্চ প্রতি দুইজন করে কর্মসূচি সহকারী নিয়োগ করা হচ্ছে, একজন পোলট্রির জন্য এবং অন্যজন গৃহপালিত পশুর জন্য)।

উপসংহার

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব্র্যাকের পোলট্রি কর্মসূচির চুলচেরা বিশ্লেষণ এ সমীক্ষায় প্রতিফলিত হয়নি। ফলে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত বা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা এ সমীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসছে না। এ সমীক্ষার ফলাফলকে কর্মসূচির সাধারণ চিত্র বলাও সমীচীন হবে না। তবু কিছু কিছু বিষয় লক্ষ্য করা গেছে, যা কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপযোগী বলে মনে হয়। যেমনঃ

১. বেশিরভাগ মুখ্য মুরগী পালক নির্দিষ্ট সংখ্যক মুরগী পালন করে না। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় যারা আছে, তাদের এ ব্যাপারে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

২. পোলট্রি পালন বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তা শুধুমাত্র এমন মহিলাদেরই দিতে হবে যারা উন্নত জাতের মোরগ-মুরগী পালনে আগ্রহী এবং যাদের মুরগী পালনের সামর্থ আছে।

৩. উন্নত জাতের স্বাস্থ্যবান মোরগ-মুরগী লাভজনকভাবে পালন করতে হলে মুরগীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ঘর থাকা আবশ্যক। মুরগীর ঘর নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও বায়ু চলাচলের উপযোগী রাখতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিত থাকা সত্বেও মুখ্য মুরগীপালনকারী কর্তৃক মোরগ-মুরগীর নিয়মিত টিকা দানে অনাগ্রহ ও গাফলতি লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে মুখ্য মুরগী পালনকারীদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দান প্রয়োজন।

৫. ব্রাঞ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মসূচি সহকারীদের উপর অর্পিত দায়িত্বের সুষ্ঠু সম্পাদনের স্বার্থেই তাদের কাজের চাপ এবং গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের সময় বন্টনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

ব্র্যাকের মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের সমস্যাঃ একটি সমীক্ষা*

কাওসার আফসানা, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী ও হাসিমা-ই-নাসরীন

পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। এই বৈষম্যের নাগপাশ সুপ্রাচীন কাল থেকে সৃষ্টি হয়েছে ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে। জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নারীরা বিশ্বের শতকরা ৬৭ ভাগ শ্রম ঘন্টা কাজ করে অথচ উপার্জন করে বিশ্ব আয়ের মাত্র ১০%। বিশ্বের নিরক্ষরদের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগই নারী এবং বিশ্বের সম্পদের শতকরা এক ভাগেরও কম নারীদের।

সম্প্রতিক বছরগুলোতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্র্যাকও ইতোমধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয় যা ব্র্যাকের উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতাকে বাধাগ্রস্ত করে। মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, এবং এসকল সমস্যা সমাধানে ব্র্যাক কী ধরনের ভূমিকা নিতে পারে তা জানার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৯৯৪ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করে।

মানিকগঞ্জ জেলার জায়গীর ও বেতিলা এবং ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল, ফুলপুর, মুক্তাগাছা ও ময়মনসিংহ সদর কার্যালয়ের ১৬ জন নির্বাচিত মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এর

* Summary of the RED research report entitled "Women programme organizers' problems in BRAC: a critical assessment" by Kaosar Afsana, et. al. 1994 November. 43p. (Summarized in Bangla by KE Kabir)

পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়ের ১১ জন মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এবং প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে জড়িত উচ্চ পর্যায়ের ৪ জন ব্যবস্থাপকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

এই ১৬ জন মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের মধ্যে ১১ জনের বয়স ছিল ২৫-২৯ বছরের মধ্যে এবং বাকী ৫ জনের বয়স ছিল ৩০ এর উর্ধ্বে। এদের মধ্যে ১৪ জন এমএসসি পাশ বাকী ২ জন এইচএসসি পাশ। নয়জন বিবাহিতা, ১ জন তালাকপ্রাপ্তা ও ১ জন বিধবা। এদের মধ্যে ১৩ জনেরই ছেলে-মেয়ে রয়েছে।

ফলাফল

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ১৬ জন মাঠকর্মীই অফিসের কাজের চাপের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা অভিযোগ করেছেন যে, কর্মসূচিতে মহিলাদের কাজের পরিমাণ বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের কাজ শুরু হয় সকাল ৮ টায় কিংবা তারও আগে। দুপুর দু'টোর দিকে ফিরে যায় খাবার খেতে, এক ঘন্টা পর আবার ফিরে আসে কাজে। দায়িত্ব সম্পন্ন করে অফিসে ফিরে আসতে বিকেল ৫/৬ টা বেজে যায়। তারপর আবার শুরু হয় খাতায় নানাবিধ তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা, প্রতিবেদন লেখা ইত্যাদি। এসব কাজ চলে রাত ৯টা/১০টা এমনকি মধ্যরাত পর্যন্ত। নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করতে অনেক সময় সাপ্তাহিক বন্ধে এমনকি ছুটির দিনেও কাজ করতে হয়। এই কর্মভারে তারা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং ক্ষুব্ধ। সবাই একই কথা বলেছে যে, কাজের তুলনায় তাদেরকে কম বেতন দেয়া হয়। তাদের ব্যক্তিগত ছুটি প্রদানের ব্যাপারেও গড়িমসি করা হয়। একজন অভিযোগ করেছে যে, তার পরিবার দু'বার তার বিয়ের আয়োজন করলেও ছুটি না পাওয়াতে তা ভেংগে যায়। আবার সহকর্মীর জরুরী ছুটির প্রয়োজনে কেউ কেউ নিজের ছুটি ভোগ করতে পারে না।

বেশিরভাগ মহিলাই জানিয়েছে যে, অফিস সংলগ্ন বাসায় থাকলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ব্যাহত হয়। মানসিক প্রশান্তির বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অবশ্য অবিবাহিত মহিলারা নিরাপত্তার কারণে অফিস-কাম-বাসায় থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তবে অফিসের এ বাসায় অবিবাহিতা কিংবা বিবাহিতা উভয়ের জন্যই মেহমান একটি সমস্যা। অতিথি এলে ব্যবস্থাপকগণ মহিলাদের সাথে রুঢ় ব্যবহার করেন। বিবাহিতা

মহিলাদের স্বামীরা সাক্ষাত করতে এলে তাদের এমন অবস্থার শিকার হতে হয়। সাপ্তাহিক বন্ধে কিংবা ছুটির দিনেও মহিলারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না। তাদেরকে ব্যবস্থাপকদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতে হয়।

মহিলা সংগঠকদের অভিযোগ, তারা নারী তাই পুরুষ ব্যবস্থাপকগণ তাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করে থাকে এবং পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় তাদের ভুল বেশি ধরা হয়, কারণ ব্যবস্থাপকগণ পুরুষ কর্মীদের মুখোমুখি হতে ভয় পান।

কেউ কেউ অভিযোগ করেছে, মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে ব্যবস্থাপকদের সাথে যাদের সুসম্পর্ক আছে তাদের অবৈধভাবে পদোন্নতি হয়। একজন অভিযোগ করেছে, দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও শিক্ষাগত কারণে তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়নি। শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি থাকার জন্য কনিষ্ঠরা জ্যেষ্ঠদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পাবার প্রক্রিয়া এতো দীর্ঘ যে কেউ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করে না।

কাজের চাপে ছেলে মেয়েদের প্রতি যত্ন নিতে পারে না। পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে অবিবাহিত মহিলা সংগঠকরা বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছে। ব্যবস্থাপকগণ গর্ভবতী সংগঠকদের কাজের চাপ না কমিয়ে অন্য দশজন মহিলার মতোই মনে করে। ফলে অনেকেই বাচ্চা নিতে সাহস পায় না।

সুপারিশমালা

মাঠ পর্যায়ের মহিলা কর্মীদের কাজের চাপ কমানো প্রয়োজন। কাজের চাপ কমানোর জন্য কাঠামোগত কর্মসূচি তৈরি করাও দরকার। ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা কিংবা কর্মীদের ঘন ঘন বদলী করা উচিত নয়। কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো দরকার। শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর

করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বিনোদনের সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া ভাল কর্মসূচি সংগঠককে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কর্মীরা যাতে অহেতুক শ্রম ঘণ্টা দীর্ঘায়িত করতে না পারে তার জন্য তদারকি করা প্রয়োজন। পুরুষদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী দূর করার ব্যাপারে ব্র্যাকের নিয়মকানুন থাকবে। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ এবং প্রয়োজনে দাপ্তরিক কাজ দেয়া যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ব্র্যাক নিরাপত্তা পলিসির জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারে। গর্ভবতী মহিলা কর্মীদের বাইসাইকেল কিংবা মটর বাইক চালানো বন্ধ করে দেয়া উচিত। প্রসবকালীন ছুটিও বাড়ানো যেতে পারে। এ সময় তারা প্রশিক্ষণ নিতে পারে এবং পায়ে হেঁটে যেতে পারে এমন দূরত্বের কোন কাজে পাঠানো যেতে পারে। তাছাড়া বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য প্রসূতি কর্মীকে শর্ত সাপেক্ষে সময় দেয়া যেতে পারে। বিপদগ্রস্ত মহিলা কর্মীদের আইনগত সাহায্যের জন্য ব্র্যাক কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।

সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন, দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে আরও জোর দিতে হবে। এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালারও আয়োজন করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে মহিলাদের কাজ ও কাজের পরিবেশ উন্নয়নে আরও সতর্ক ও যত্নশীল উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

ব্র্যাকের অর্থপুষ্ট প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি ঃ মতলব এলাকার সাতটি ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর একটি সমীক্ষা*

হাসান জামান, সায়মা রহমান, সাহেদ হোসেন ও মাসুদ রানা

ভূমিকা

শহরে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাগুলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি তেমন কোন উপকারে আসে না। দক্ষতার অভাবে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করতে পারে না। তাই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে এসবের সরাসরি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। এ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন আর্থিক নিশ্চয়তা। এ নিশ্চয়তা নেই বলেই দিন দিন দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ছে। এজন্য ব্র্যাক তাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাদের বাসস্থানের আশেপাশেই এমন কতিপয় উদ্যোগ হাতে নিয়েছে যাতে তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে। এ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে ব্র্যাক এ জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প কিংবা ব্যবসায়িক উদ্যোগে উৎসাহিত করে। মতলব এলাকায় এরূপ উদ্যোগের জন্য ঋণ দেয়া হয়েছে এরকম সাতটি প্রকল্প বাছাই করা হয়। এ গ্রামীণ প্রকল্পগুলো কতটুকু লাভবান হতে পেরেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ গবেষণাটি হাতে নেয়।

কোন প্রতিষ্ঠানের ক্লায়েন্ট বা খদ্দের টিকে থাকলে প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ঋণ নিয়ে তা বিনিয়োগ না করে তবে তার পক্ষে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কখনও কখনও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই ব্র্যাকের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে গ্রাম সংগঠনের সদস্যরা কি হারে লাভবান হয় তা দেখার জন্য এ গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়।

---

* Summary of the RED research report entitled "The profitability of BRAC financed projects: a study of seven micro-enterprises in Matlab" by Hassan Zaman et. al. 1994 December. 18p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

গবেষণা পদ্ধতি

মতলব এলাকার ৭০ জন গ্রামবাসীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ৭০ জনের সকলেই গবেষণা শুরু হওয়ার ন্যূনতম তিনমাস পূর্বে ঋণ নিয়েছে। গবেষণাধীন যে সাতটি ঋণ প্রকল্প বাছাই করা হয় তা ছিল ধান চাষ, আলু চাষ জাল তৈরি করা, মুদী দোকান, গরু মোটা তাজাকরণ, ছাগল পালন ও হাঁস-মুরগী পালন। ব্র্যাক আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের অধীনে মতলব এলাকাকে চারটি সেলে ভাগ করা হয়। প্রথম সেলে ঐ সমস্ত গ্রামগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে ব্র্যাক আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে কাজ করে। দ্বিতীয় সেলে শুধু ব্র্যাক কাজ করে এবং তৃতীয় সেলে শুধু আইসিডিডিআর,বি কাজ করে এবং চতুর্থ সেলে এ দুই প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকান্ডই নেই।

প্রতি প্রকল্পের জন্য ১০ জন গ্রামবাসীকে বাছাই করা হয়। পাঁচজনকে বেছে নেয়া হয় যেখানে ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে কাজ করে আর বাকী পাঁচ জনকে বেছে নেয়া হয় যেখানে শুধু ব্র্যাক কাজ করে। ১৯৯৪ সারের আগষ্ট মাসে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

ফলাফল

গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামীণ পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে আলু চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ও জাল বুনন ইত্যাদি কর্মকান্ডের ভূমিকা অনেক বেশি। এসব কাজে যারা জড়িত তাদের প্রত্যেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকার বেশি আয় করেছে। মুদী দোকানদারের আয় ছিল মোটামুটি। ছাগল পালন কিংবা ধান চাষ আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি। গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্পে দেখা গেছে, লাভ তো হয়নি বরং ক্ষতি হয়েছে। এ গবেষণায় লাভের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কারণও নির্ণয় করা হয়। এ পার্থক্যের প্রধান কারণ হিসাবে উৎপাদনের পরিমাণের পার্থক্যকেই চিহ্নিত করা হয়। দেখা গেছে, এক শতাংশ জমিতে আলু উৎপাদনের পরিমাণ ১.২৭ মণ কিন্তু ধান উৎপাদনের পরিমাণ ০.৪৮ মণ। আবার আলু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মতলবে যখন এক মণ আলুর দাম ৩০০ টাকা তখন সেখানে এক মণ ধানের দাম ২৫০ টাকা। ফলে ধান চাষীরা লাভবান হতে পারেনি। আবার দেখা গেছে, যারা জাল বুনে

বিক্রি করছে তারা বেশ আয় করতে পেরেছে যদিও জাল তৈরির উপাদানের দাম চড়া ছিল। তথাপিও মৌসুমের সময় জালের দাম অত্যাধিক থাকায় ভাল লাভ হয়। হাঁস-মুরগী পালনের ক্ষেত্রে লাভের সম্ভাবনা যেমন অনেক তেমনি ঝুঁকিও আছে। ছাগল পালন একটি লাভজনক ব্যবসা হলেও এ ব্যবসা বেশি দিন টিকে থাকেনি। আরডিপি ছাগল পালনের জন্য যখন প্রথম ঋণ দেয় তখন এর বেশ কদর ছিল। পরবর্তীতে এক ধরনের রোগ এদের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে এ প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্পটিও লাভজনক। ব্র্যাক ঋণ দেয়ার সময় খুব ছোট বাছুর কেনার পরামর্শ দেয়। ফলে ছোট বাছুর বড় করতে বেশি সময় ও বেশি অর্থ খরচ করতে হয়। সদস্যরা মনে করে, তাদের এ বিনিয়োগকৃত টাকা বহুদিন ধরে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়। এ প্রকল্পে কোন লাভ না হওয়ার এটিও একটি কারণ।

সুপারিশমালা

- ঋণ আবেদনকারীদের সতর্কতার সাথে বাছাই করা উচিত এবং লাভজনক ব্যবসা প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা উচিৎ
- কিছু কিছু নির্ধারিত ব্যবসার জন্য ঋণের পরিমাণ বাড়ানো উচিত যেমন: গগরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্পের জন্য ঋণের পরিমাণ ৫,০০০ টাকায় উন্নীত করা। জাল তৈরি প্রকল্পের জন্য ঋণের পরিমাণ ৬,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মুদী দোকানের জন্যও ৬,০০০ টাকা ঋণ প্রদান বাঞ্চনীয়।
- ব্র্যাক কর্তৃক সরবরাহকৃত উপদানসমূহের মান উন্নত করার পদক্ষেপ নেয়া দরকার।
- উপযুক্ত সময়ে ঋণ প্রদান বাঞ্ছনীয়। ব্র্যাক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ঋণ প্রকল্প চালু করতে পারে যেমন-ঈদ ঋণ। এতে গ্রাম সংগঠনের সদস্যরা ঈদের সময়ে গরু-ছাগল বিক্রয়ের জন্য গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বেশি উদ্বুদ্ধ হবে।

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনভুক্ত পাঁচজন মহিলা সদস্যার সাফল্যের খতিয়ান*

পারুল লতা বিশ্বাস

বাংলাদেশের জনসাধারণের শতকরা ৮০ জনের বেশি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নের জন্য ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ঋণদান কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত আট লাখেরও বেশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করেছে যার অধিকাংশই মহিলা (৮২%) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহযোগিতা এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে গ্রামীন দরিদ্র মহিলারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা আরডিপির মহিলারা তারই একটি দৃষ্টান্ত।

ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে দরিদ্র মহিলাদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়া, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের বিভিন্ন পর্যায়সমূহকে বিশ্লেষণ করা এবং তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাই এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। পারিবারিক পরিবেশে অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে।

এ সমীক্ষার জন্য আরডিপির ঝিকরগাছা এলাকা থেকে পাঁচজন মহিলাকে নির্বাচন করা হয়েছে যারা প্রত্যেকেই পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে ব্র্যাকের কর্মসূচির সাথে জড়িত। গবেষকের মতামতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আরডিপি'র এলাকা ব্যবস্থাপক ও কর্মসূচি সংগঠকদের মতামতও মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণায় এ পাঁচজন সদস্যার পরিচিতি ও পূর্ব পুরুষের ইতিহাস, ব্যাকে যোগদানের পূর্ববর্তী অবস্থা, ব্র্যাকে যোগদান ও কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং সর্বশেষ অবস্থা দেখা হয়েছে।

---

* ১৯৯৪ সালের একটি গবেষণা প্রতিবেদন। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ।

আনোয়ারা

এক অসচ্ছল দরিদ্র ভূমিহীন পরিবারে তার জন্ম। অভাবের তাড়নায় ছোট বেলা থেকেই ফুফুর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতেন। বিবাহের এক বছরের মধ্যে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি প্রথম বিধবা হন। পনের বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্ক এক লোকের সাথে দ্বিতীয়বার বিয়ে হন। দ্বিতীয় স্বামী অসুস্থ, তাই বিয়ের ৬ মাসের মধ্যেই তাকে অন্ন সংস্থানের জন্য প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ শুরু করতে হয়। দ্বিতীয়বার বিধবা হন ৩০ বছর বয়সে। আনোয়ারা স্বউদ্যোগে ১৯৮২ সালে ব্র্যাক এর 'হাজির আলী শ্রমজীবি মহিলা সমিতিতে' যোগ দেন। সামাজিক সচেতনতা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সাথে তিনি মুরগী পালন ও রেশম পোকা পালনের উপর প্রশিক্ষণ পান। ব্র্যাক অফিসে রান্নার কাজ, তুঁতগাছ পাহারা দেয় ও রেশম পোকা পালন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তিনি সংসারের উন্নতি করতে পেরেছেন। ব্র্যাকের ঋণের মাধ্যমে ৪ শতাংশ জমি কিনেছেন। তাছাড়া সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, গরু-ছাগল ও মোরগ-মুরগী করা ছাড়াও মেয়ের কানের সোনার রিং কিনে দিয়েছেন। তবে তার সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কোন কাজে লাগাননি। মাত্র ১৩ বছরের কিশোরী মেয়েকে দোজবর পাত্রের সাথে বিয়ে দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে তালাক দিয়ে তাকে গৃহে ফিরিয়ে আনতে হয়। মেয়ের বিয়েতে সঞ্চিত অর্থের সবটাই ব্যয় করেছেন। এখন তার সামনে দু'টি কাজ। মেয়েকে ভাল পাত্রের সাথে আবার বিয়ে দেয়া এবং ঘরে টালি দেয়া।

সরবানু

দরিদ্র পিতাকে আর্থিক সহযোগিতা করতে কিশোরী সরবানু বিভিন্ন মৌসুমে ফসল কুড়াতেন। এক দরিদ্র পাত্রের সাথে ১৬ বছর বয়সে সরবানুর বিয়ে হয়। স্বামীর মনিবের বাড়িতে নুতন সংসার পাতেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে ঐ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতেন। ১৯৮৪ সালে তার স্বামী সর্পদংশনে মারা যায়। তিন মেয়ে নিয়ে বিধবা হন তিনি। অসহায় সরবানু সরকারি রিলিফ, ছোট ভাইয়ের ফেরী ব্যবসা ও নিজে হাঁস-মুরগীর ডিম বিক্রি করে সংসার চালানোর চেষ্টা করেন। ১৯৮৫ সালে "পুরন্দরপুর কলোনী শ্রমজীবি মহিলা সমিতিতে" যোগ দেন। ব্র্যাক থেকে তিনি ব্যবহারিক শিক্ষাসহ মুরগী পালন ও রেশম পোকা পালনের উপর প্রশিক্ষণ এবং একাধিক ঋণ পান। গাভী পালন, মুরগী পালন, পেয়ারার চাষ এবং তুঁতগাছ

পাহারা দেয়ার কাজ করে তিনি এখন অনেকটা সচ্ছল। ব্র্যাকের সহযোগিতা ও নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করেছেন। প্রায় ১০ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত এবং এক বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে বর্গাচাষ করতে দিয়েছেন। এখন কন্যাত্রয়ের সুখী জীবন নিশ্চিত করাই তার একমাত্র ব্রত।

ছমিরন

এক ভু-স্বামী পরিবারের মেয়ে এবং আর এক সচ্ছল ঘরের বউ ছিলেন। নিজের রয়েছে ৮৫ শতাংশ জমি। স্বামীর অসুস্থতায় ও ভাসুরের প্রতারণার শিকার নিঃসন্তান ছমিরন পালিত কন্যা ও নাতী-নাতনী নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। ১৯৮২ সালে নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজ গ্রাম নীলকণ্ঠ নগরে ব্র্যাক সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের সভানেত্রী ছমিরন ব্র্যাক থেকে ব্যবহারিক শিক্ষাসহ লিডারশীপ ও মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ পান। গাভী পালন প্রকল্পে একবারই ঋণ নিয়েছেন। নাতীকে নিয়ে ঋণের টাকা ফলের ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। দশ সদস্য বিশিষ্ট বিরাট সংসারের ভরনপোষণ ছাড়া সংসারের জিনিসপত্র ক্রয়, আসবাবপত্র তৈরী, টিউবওয়েল দেয়া, ব্যবসায় সুবিধার জন্য বাই-সাইকেল ক্রয় এবং ঘর মেরামত করেছেন। তাছাড়া বাড়িতে গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী ও রয়েছে।

সেলিনা

তিন সন্তানের এক বিধবা মা। শ্বশুর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সেলিনা তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের ভিটায় চলে আসেন। অসচ্ছল পিতার সংসারে তিন ছেলে-মেয়েসহ নিজেকে বোঝা মনে করতেন। তাই তিনি কোন কাজ করার চেষ্টা করেন। ১৯৮৭ সালে সেলিনা ব্র্যাকের সংগঠনে যোগ দেন। সমিতির সভানেত্রী সেলিনা ব্র্যাক থেকে একাধিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। চিক রিয়ারিং ইউনিটের জন্য একবারই ঋণ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি চিক রিয়ারার (পোলট্রি ওয়ার্কার) এবং প্যারাভাটেনারী হিসাবে কাজ করছেন। চৌদ্দটি সফল ইউনিটের রিয়ারার সেলিনা তার অর্জিত টাকার বেশির ভাগ মেয়ের চিকিৎসায় খরচ করে মেয়েকে পঙ্গুত্বের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। বড় ছেলেকে মেট্রিক পাশ করানোর পর কোন কাজে নিয়োজিত করবেন এবং মেয়েদের যতদুর পারেন পড়ালেখা করাবেন।

বেবী

জন্মের ৯ মাস পর বাবাকে হারিয়ে নয় বছর নানার বাড়ি থাকার পর তার মা দ্বিতীয় বিয়ে করে। বেবী তার মায়ের সাথে সৎ বাবার বাড়িতে আসেন। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালীন অবস্থায় মাত্র ১১ বছর বয়সে ১৯৭২ সালে এক যুবকের সাথে বেবীর বিয়ে হয়। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালে তার স্বামী মারা যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেঝ ভাসুরের সাথে বেবীর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। নয় বছর ঘর করার পর দ্বিতীয় স্বামীর অত্যাচার ও প্রতারনায় তিনি স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য হন।

পিতৃহীন অসহায় বেবী তিন ছেলে-মেয়েসহ সৎ বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কোনমতে নিজের ও সন্তানদের অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করছিলেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ব্র্যাকের "পটুয়াপাড়া শ্রমজীবি মহিলা সমিতিতে" যোগ দেন। ক্ষুদ্র দলের নেতা বেবী ব্র্যাক থেকে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ পেয়েছেন। ব্র্যাক পরিচালিত আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির কল্যাণে বর্তমানে তিনি একজন চিক রিয়ারর, পোল্ট্রি ওয়ার্কার এবং পশু চিকিৎসক। সাড়ে চার বছরের সফল ইউনিটের রিয়ারর বেবী তিন বেলা অন্ন সংস্থানের সাথে সাথে বসত ঘর ও সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করেছেন। আলাদাভাবে অন্য একটি ঘর তৈরী করে NFPE স্কুলের জন্য ভাড়া দিয়েছেন। তাছাড়া তিনটি ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে।

উপসংহার

মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। উপরোক্ত পাঁচজন মহিলাই শুধু তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেনি, হাজার হাজার মহিলা আজ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই পাঁচজন মহিলা ব্র্যাকের সহযোগিতায় আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সদস্যদের গ্রাম সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার কারণঃ একটি সমীক্ষা*

মোঃ কায়সার আলী খান ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) অন্যতম। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে এ কর্মসূচির শুরু। পল্লী এলাকার ভূমিহীন দরিদ্র নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি বিধান করাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে এ কর্মসূচি পল্লীর ভূমিহীনদের গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে, তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে, সঞ্চয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করে, ঋণ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান বাড়াতে সহায়তা করে। এ কর্মসূচিতে প্রতি বছর ২০ থেকে ৩০টি নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দেড় থেকে দুই লক্ষ নতুন সদস্যা যোগদান করে। সাম্প্রতিককালে, প্রতি বছর কিছু সংখ্যক সদস্য সংগঠন ছেড়ে চলে যায়। ১৯৯২ সালে ১০২,৮১৪ জন, ১৯৯৩ সালে ৭৮,৭২৫ জন এবং ১৯৯৪ সালে ৬৫,৪১২ জন সদস্য গ্রাম সংগঠন ছেড়ে চলে যায়; এদের মধ্যে অনেককে ব্র্যাক বহিস্কার করে আবার অনেকে নিজ ইচ্ছায় সংগঠন ত্যাগ করে। এই বিপুল সংখ্যক সদস্যদের সংগঠন ত্যাগ ব্র্যাক ব্যবস্থাপনার নিকট একটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং এর কারণ নির্ণয়ের লক্ষ্যে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল, সংগঠন ছেড়ে যাওয়া সদস্যদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা, সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা, ব্র্যাকের কার্যক্রমের উপর এবং সক্রিয় সদস্যদের উপর এর প্রভাব পর্যালোচনা করা।

* Summary of the RED research report entitled "Why VO members drop out" by Md. Kaiser Ali Khan and AMR Chowdhury. 1994 October. 24p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

পদ্ধতি

এ গবেষণার জন্য আরডিপি'র পাঁচটি এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলতঃ এ পাঁচটি এলাকা থেকেই বিপুল সংখ্যক সদস্য গ্রাম সংগঠন পরিত্যাগ করে। প্রতিটি এলাকা থেকে ১২টি গ্রাম সংগঠন নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি সংগঠন থেকে ৭ জন করে সংগঠনত্যাগী ও আবার ৭ জন করে সক্রিয় সদস্য বাছাই করা হয়। এভাবে মোট ৬০টি গ্রাম সংগঠন থেকে ৮৪০ জন সদস্য (৪২০ জন পুরুষ এবং ৪২০ জন মহিলা) গবেষণার জন্য বাছাই করা হয়। সংগঠনত্যাগী ও সক্রিয় সদস্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন সংগঠন ছেড়ে যাওয়া ও সক্রিয় সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে থেকে কর্মসূচি সহকারী, কর্মসূচি সংগঠক ও এলাকা ব্যবস্থাপকগণ।

ফলাফল

সংগঠনত্যাগীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা

সমীক্ষায় দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট বয়সের সদস্যদের মধ্যেই সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। সংগঠনত্যাগী সদস্যদের বয়সের গড় ৩৬.৮ বছর। এদের শতকরা মাত্র ১৮% শিক্ষিত। শিক্ষার এই হার সক্রিয় সদস্যদের তুলনায় অনেক কম। সক্রিয় সদস্যদের বয়সের গড় ৩৪.৮ বছর। পেশার দিক থেকে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন তফাত নেই। তবে দেখা গেছে, সক্রিয় সদস্যদের তুলনায় সংগঠনত্যাগীদের ভূমির পরিমাণ বেশি হলেও সক্রিয় সদস্যদের চেয়ে বেশি সংখ্যক সংগঠনত্যাগী সদস্য সব সময় খাদ্য ঘাটতির শিকার। সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, সক্রিয় সদস্যরা ব্র্যাক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ বেশি পেয়েছে এবং ঋণ গ্রহনের বেলায় ও তাদের প্রাধান্য রয়েছে।

সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার কারণ

সদস্যদের সংগঠন ছেড়ে চলে যাওয়ার একাধিক কারণ দেখা যায়। মহিলা সদস্যদের সংগঠন ছেড়ে চলে যাওয়ার মূল কারণগুলির মধ্যে পারিবারিক সমস্যাই অন্যতম। স্বেচ্ছায় সংগঠন ত্যাগের কারণ ব্র্যাকের সেবার মানের সাথে সম্পৃক্ত। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিস্কার মূলতঃ সংগঠনের আইন ভঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত।

গ্রাম সংগঠন গঠনের সময় কিছু সংখ্যক কর্মসূচি সংগঠক লক্ষীভূত গোষ্ঠীকে বিভিন্ন রকম আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধার কথা শুনিয়েছিলেন। এত জনগণ গ্রাম সংগঠনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিল। তারা মনে করত, গ্রাম সংগঠনে যোগ দিলে অল্প সময়ে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। কিন্তু অনেকের জন্য এটা স্বপ্নই থেকে যায়। ফলে তাদের কেউ কেউ সংগঠন ছেড়ে চলে যায়। সদস্যরা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কারণে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে তারা এভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ তা পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করলে অনেক সদস্য সংগঠন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য ব্র্যাকের নিয়ম কানুনে মাঝে মাঝেই পরিবর্তন ঘটানো হত। অনেক সদস্য এ পরিবর্তন সহজভাবে মেনে নিতে না পেরে সংগঠন ত্যাগ করে। দেখা গেছে, অনেক সদস্য সংগঠন থেকে ঋণ নিয়েছে, অথচ তারা এ সংগঠনের সদস্য হওয়ার নিয়মের আওতায় পড়ে না। পরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের সদস্যপদ বাতিল করে দেয়।

সদস্যদের ঋণ প্রদানের সময় মোট প্রদেয় টাকা থেকে শতকরা ১০ টাকা কেটে রাখত (৫ টাকা গ্রুপ ট্রাস্ট ফান্ড, ৪ টাকা সঞ্চয় ও ১ টাকা বীমার কিস্তি জন্য)। কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় সদস্যদের সুদসহ সম্পূর্ণ টাকাই ফেরত দিতে হয়। এটা তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সংগঠনত্যাগী অনেক সদস্য বলেছে, ব্র্যাক অন্যান্য এনজিওদের তুলনায় অনেক বেশি হারে সুদ নিয়ে থাকে। পূর্বে ১৬% সুদ নিত, কিন্তু এখন সে সুদের হার ২০% এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপরন্তু, সঞ্চয়ের উপর সুদ ৯% কমিয়ে থেকে ৬% করা হয়েছে।

ব্র্যাক ৩ বছরে পরিশোধযোগ্য ৬০০০ টাকা গৃহায়ন ঋণ দিয়ে থাকে। গৃহায়ন ঋণ গ্রহণ করতে হলে একজন সদস্যকে পূর্বেই ১,২৫০ টাকা জমা দিতে হয়। আরডিপি'র সঞ্চয় নীতিও বেশ অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা গেছে। সদস্যদের সঞ্চয় থেকে জরুরী প্রয়োজনেও টাকা উঠানো যায় না। টাকা উঠানোর প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের তিক্ততা সৃষ্টি হয়। সদস্যরা জানিয়েছে, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে গৃহায়ন ঋণ গ্রহণ করতে কোন জামানতের প্রয়োজন পড়ে না। এ খাতে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দেয় এর চেয়ে বেশি এবং পরিশোধের সময়সীমাও বেশি।

ব্র্যাকের পাশাপাশি আশা, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কাজ করছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন ত্যাগী অনেক সদস্য অধিকতর সুযোগ সুবিধার জন্য এসব সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কতিপয় এলাকায় ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে পুলিশী হয়রানি ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে এ ব্যবস্থা তাদের নেয়া হবে, এ আশংকায় অনেক সদস্য সংগঠন ছেড়ে চলে গিয়েছে। ব্র্যাকের কতিপয় যৌথ কর্ম পরিকল্পনায় সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। এর অনেকগুলোই ছিল অলাভজনক।

আরডিপি কর্মীদের বার বার বদলি করা হয়। সদস্যদের একাধিকবার নুতন কর্মীদের সাথে কাজ করতে হয়। এই নতুন অপরিচিত মুখের সাথে সদস্যরা সহজ হতে না পেরে উদ্যম হারিয়ে ফেলে। গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিল, উদ্বুদ্ধ করার কৌশল সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিলনা। এসব কারণে সদস্যদের মধ্যে ব্র্যাকের প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

অনেক সদস্য অসুস্থতার কারণে সাপ্তাহিক সভা ও প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেনি। এবং গৃহীত ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহার না করে চিকিৎসার জন্য খরচ করেছে। এর ফলে অনেক সদস্য স্বেচ্ছায় ব্র্যাক ত্যাগ করেছে। আবার ব্র্যাক অনেকের সদস্যপদ বাতিলও করেছে। সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, আরডিপি'র কর্মীগণ তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণ আদায়ের জন্য সদস্যদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে

থাকে। সদস্যরা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে কিংবা তাদের সঞ্চয় থেকে এই ঋণ পরিশোধ করে। এসব সদস্যদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাড়ায়, ফলে তারা সংগঠন ছেড়ে চলে যায়।

গবেষণায় দেখা যায়, সদস্যদের সংগঠন ত্যাগ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সংগঠনত্যাগী সদস্যরা অন্যান্য সক্রিয় সদস্যদের নিরুৎসাহিত করার জন্য ব্র্যাক সম্পর্কে নানা রকম গুজব ছড়ায়। এই গুজব আরডিপি'র সক্রিয় সদস্যদের বিভ্রান্ত করে। এছাড়াও কতিপয় গ্রাম সংগঠনে সদস্যাভাব দেখা দিলে পাশাপাশি অবস্থানরত কিছু গ্রাম সংগঠনকে একত্রীকরণ করা হয়।

আলোচনা

১৯৯২ সালে সংগঠনত্যাগী সদস্যদের হার ছিল ১৫%। এই হার বৃদ্ধি পাওয়ার কতিপয় কারণ রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, ভুলবশতঃ কিছু সংখ্যক সচ্ছল ব্যক্তিকে আরডিপি'র আওতায় আনা হয়। কিন্তু একসময় নীতিগত কারণে এসকল সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল করা হয়। তবে ১৯৯৩ সালে এ হার হ্রাস পেয়ে ৭% নেমে আসে।

সংগঠনত্যাগী সদস্যদের মধ্যে মহিলা সদস্যদের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সমাজে মহিলারা একটি অবহেলিত গোষ্ঠী। আরডিপি তাই মহিলাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সদস্যপদ দেয়। দেখা গেছে, ১৯৯৪ সালে সংগঠনের সদস্যদের ৮৫.৬% ছিল মহিলা।

আরডিপি'র সেবায় সকল সদস্যই সন্তুষ্ট থাকবে এমন কথা নেই। স্বভাবতই কিছু কিছু সদস্য সংগঠন ছেড়ে চলে যাবে। তবে লক্ষণীয় এই হার গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে কিনা। এই হার প্রত্যাশিত সীমার (ব্র্যাক প্রত্যাশিত হার ৫%) মধ্যে রাখতে সময়োপযোগী নীতি প্রণয়ন আবশ্যক। বস্তুত: তিনটি কারণই সংগঠনত্যাগের জন্য বেশি দায়ী। যেমন, আরডিপি'র নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি, সেবার মান এবং ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে নেয়া আইনানুগ বা অন্যান্য ব্যবস্থা। আর এসবই ঋণ বিতরণের সাথে সম্পর্কিত। এ অপ্রত্যাশিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আরডিপি কতিপয় পদক্ষেপ হাতে নেয়। এর

মধ্যে গ্রুপ ট্রাষ্ট ফান্ড বাতিল, সঞ্চয়ের টাকা উঠানোর যথাযথ নীতি প্রনয়ন, নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন ও আইজিভিজিডি কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি অন্যতম। আশা করা যায়, গ্রাম সংগঠন ত্যাগের হার প্রত্যাশিত সীমার মধ্যেই থাকবে। তবে এ বিষয়টি ভবিষ্যতে সাবধানতার সাথে নিয়মিতভাবে অবলোকন করতে হবে।

গ্রাম সংগঠনের গঠন প্রক্রিয়ার উপর একটি পর্যবেক্ষণ*

মঞ্জুরুল মান্নান, এ এম আর চৌধুরী, আব্বাস ভূঁইয়া ও মাসুদ রানা

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরডিপি) ব্র্যাকের একটি মূল কর্মসূচি। গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত করে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে কর্মসূচি সংগঠকগণ প্রাথমিক পর্যায়ে কী কী বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রাম সংগঠনে কি কারণে যোগ দেয় ইত্যাদি বিষয় চিহ্নিত করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কর্মসূচি সংগঠক ও সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়, আরডিপি কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কিভাবে গ্রাম সংগঠনে যোগদানে উৎসাহিত করেছে, এ কর্মসূচি সমাজে কী পরিবর্তন এনেছে ইত্যাদি অবলোকন করাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা কার্যক্রম মতলব থানার উদ্দমদি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উদ্দমদি গ্রামে প্রায় ৬০ জন গ্রুপ সদস্য নিয়ে তিনটি গ্রাম সংগঠন গড়ে উঠেছে। সকল সদস্যই ছিল মহিলা। গবেষণায় নির্বাচিত ২০ জন

* Summary of the RED research report entitled "Formation of the village organizations: the first three months" by Manjurul Mannan, et al. 1994. 35p. (Summarized in Bangla by Senjuti Ara)

মহিলা সদস্য এবং ব্র্যাকের কার্যক্রম সম্পর্কে মোটামুটিভাবে তথ্য দিতে পারে এমন অন্যান্য ছয় ব্যক্তিরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

ফলাফল

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) কাজ করে। প্রথম ধাপে আরডিপি অফিস ঘর স্থাপন করে। এরপর অফিসের ১০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামসমূহে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলার জন্য লক্ষীভুত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর একটি জরিপ চালায়।

একজন কর্মসূচি সংগঠক কোন নির্দিষ্ট গ্রাম নির্বাচন করে সেখানে যান এবং সে এলাকার পরিবারগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রথম দিকে একজন কর্মসূচি সংগঠকের ভাবনা থাকে কিভাবে তিনি টার্গেট বা লক্ষীভূত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করবেন, কিভাবে তাদের গ্রাম সংগঠন গড়ার কাজে এবং তাতে যোগদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন। স্থানীয় জনসাধারণকে ব্র্যাকের ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলার জন্য একজন কর্মসূচি সংগঠককে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়। ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দিতে হয়।

একজন সংগঠক যখন নতুন একটি এলাকায় যাবেন, তখন তার প্রথম কাজ হবে দরিদ্র খানা বা পরিবারগুলো চিহ্নিত করা এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা শুরু করা। সাধারণভাবে আলোচনার জন্য তিনি একজন চটপটে পুরুষ বেছে নেন। আলোচনার সময় তিনি তাদের নিকট তার উপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করেন।

এ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তারা যখন একে অন্যের খুবই কাছাকাছি হয়ে পড়েন, তখন কর্মসূচি সংগঠক তাদের সন্তানাদি সম্পর্কে জেনে নেন। তারা স্কুলে যায় কিনা, বা তারা বিবাহিত কিনা এ ধরনের প্রশ্ন করে সব জেনে নেন।

কর্মসূচি সংগঠক যখন বিভিন্ন খানা পরিদর্শন করেন, তখন তাকে বসার জন্য চেয়ার বা টুল দেয়া হয়। কিন্তু তিনি চেয়ার বা টুলে না বসে সকলের সঙ্গে নীচেই বসেন। এতে খানার বাসিন্দারা অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও মনে মনে খুশী হয়। সেখানে তারা যাই আলোচনা করুক, কর্মসূচি সংগঠক এ আলোচনার

ভেতর থেকে এমন সব লোক বেছে নেন, যারা শেষ পর্যন্ত গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তাকে সক্রিয় সহাযোগিতা দেবে।

কর্মসূচি সংগঠক লক্ষীভূত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একান্তভাবেই মিশে যান। যেমন, বয়স্কা মহিলাকে তিনি চাচী বলে সম্বোধন করেন। যখন কর্মসূচি সংগঠক পুরুষদের সঙ্গে আলোচনা করেন মহিলারাও দূরে থেকে তা শোনেন। তারা চুপ থাকে কিন্তু সব আলোচনাই আগ্রহের সঙ্গে শোনে এবং এক সময় এ মহিলারাই গ্রাম সংগঠনে যোগ দেয়।

গ্রাম সংগঠন ব্র্যাক কর্মী এবং দরিদ্রদের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে। ব্র্যাক গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্রদের সংগঠিত করে। সাধারণভাবে বিবাহিত মহিলাদেরই গ্রাম সংগঠনে যোগদানে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়।

গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রথমত, তিন মাস তাদের টাকা পয়সা সঞ্চয় করতে হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের সমাজ সচেতনতা বিষয়ক শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয়। তৃতীয়ত, তাদের নিয়মিতভাবে গ্রাম সংগঠনের সভাগুলোতে যোগান করতে হয। এরূপ যোগানের ফলে তারা সাংগঠনিক রীতিনীতি এবং শৃঙ্খলা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত সঞ্চয়। গ্রাম সংগঠনের সদস্যাগণ বলেন, তাদের স্বামীদের উৎসাহের কারণেই তারা গ্রাম সংগঠনে যোগ দেয়। জনৈকা সদস্যা বলেন, আমার স্বামী বলেন, চাষের জন্য আমাদের গরু চাই। তাই আমার স্বামী সঞ্চয় জমা দেয়ার জন্য আমাকে নিয়মিত টাকা দেন। সাক্ষাৎদানকারী সকল মহিলাই প্রায় একই কথা বলেন।

মহিলা সদস্যরা মনে করেন ব্র্যাকে এরূপ সঞ্চয়ের ফলে তারা অনাবশ্যক খরচ থেকে বেচে যায়। পূর্বে সুযোগ না থাকায় তারা কোনরুপ সঞ্চয় করতে পারেনি। ব্র্যাক তাদের এ সুযোগ করে দিয়েছে। জনৈকা মহিলা জানান, “আমি এখন টাকা সঞ্চয় করতে পারি। পূর্বে সঞ্চয়ের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না

ব্র্যাকের কল্যাণে এমন সুযোগ আমরা পেয়েছি"। অনেক মহিলা সদস্যা মনে করেন, ব্র্যাকে তাদের সঞ্চয়ের ফলে তারা এখন প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারে।

ব্র্যাকের গ্রুপ সদস্যাদের জন্য সমাজ সচেতনতা বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। ২৬ দিন ব্যাপী এই শিক্ষা তাদের সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন জ্ঞান দান করে। এ শিক্ষা গ্রহণের সময় সাধারণত প্রতিদিন হাজিরা নেয়ার মাধ্যমে তাদের ক্লাস শুরু হয়। নাম দস্তখতসহ মোটামুটিভাবে তারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান এ ২৬ দিনের শিক্ষা পেয়ে থাকে। গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় ১৭টি অঙ্গিকার নিয়েও আলোচনা করা হয়। অঙ্গীকারগুলো হচ্ছে, আমরা কোন অসৎকাজ বা অবিচারে লিপ্ত হবো না, আমরা কঠোর পরিশ্রম করবো, আমরা আমাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবো, আমরা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করবো ইত্যাদি।

উপসংহার

এ আলোচনায় গবেষকগণ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তথা ব্র্যাকের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ককে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে সঞ্চয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তারা ব্র্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করে ছোট খাটো ব্যবসা পরিচালনা করছে।

এটা পরিষ্কার যে, গ্রাম সংগঠনে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বাধা রয়েছে। তবে সে সব বাধা বিপত্তি ক্রমশই দূরীভূত হচ্ছে।

গ্রামীণ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনাঃ জামালপুর জেলার নারায়নপুর গ্রামের একটি চিত্র*

শাহনাজ আকতার

ভূমিকা

উৎপাদনের জন্য ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণতঃ দু'ধরনের প্রয়োজনে মানুষের ঋণের চাহিদা হয়। প্রথমত, বেঁচে থাকার তাগিদে, আর দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য। ঋণ গ্রামের মানুষের শুধু আয়ই বাড়ায় না, ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সুযোগ বাড়ে, কৃষি মজুরী বৃদ্ধি করে, বর্গা চাষীর দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ায়, কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানার সুযোগ করে দেয় ইত্যাদি। তাই গ্রামের প্রায় সবাই বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ ঋণ সাধারণতঃ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এ দু'ধরনের উৎস থেকেই নিয়ে থাকে। সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের প্রবেশের মাত্রা এখনও খুবই সীমিত। তবে ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক ও বিআরডিবি ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহাজন, ধনী কৃষক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দোকানপাট ইত্যাদি। গ্রামের কোন প্রকৃতির লোক কোন উৎস থেকে কেন ঋণ নেয় এবং এর ব্যবহার কী ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব কী তা জানাও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

---

* ১৯৯৪ সালের একটি গবেষণা প্রতিবেদন। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ।

গবেষণা পদ্ধতি

জামালপুর জেলার সদর থানার তিতপল্লাইউনিয়নের নারায়নপুর গ্রামে এ গবেষনাটি করা হয়। এ গ্রামে মোট খানার সংখ্যা ৩০৩টি, মোট লোকসংখ্যা ১,২৭১ জন (পুরুষ ৬৮০ জন< মহিলা ৫৯১ জন)। প্রতিটি খানাকেই এ গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। গ্রামে ঋণদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কেস ষ্টাডি ও গ্রামবাসীর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ফলাফল

এ গ্রামে ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে ব্যাংক, বিআরডিবি, বিএডিসি, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং গ্রামের অরেজিষ্ট্রিকৃত সমিতি রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাজন, ধনী কৃষক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দোকানদার। সরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রামীণ জনগণের মোট চাহিদার খুব সামান্যই পূরণ করতে পেরেছে। এ গ্রামের ৬১ টি খানার কোন জমি নেই, ১০৬টি খানার শুধুমাত্র ভিটেবাড়ি আছে। এদের মধ্যে ১৬২টি খানার জমি, বাড়িঘর কিংবা অন্য কোন সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ নেয়ার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া বিভিন্ন অদক্ষতা, দুর্নীতি ও জটিলতার জন্য ছোট ও মাঝারি কৃষকগণের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ খুবই সীমিত।

এ গ্রামে বিএডিসি'র গভীর নলকূপ ও আলু চাষ প্রকল্প চালু ছিল। তবে বর্তমানে কেবলমাত্র আলু চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকগণ সুবিধা পাচ্ছে। ১৯৯২ সাল থেকে গভীর নলকূপটি বন্ধ আছে। গ্রামের ২০-৩০ জন সংগঠিত হয়ে (বিএডিসি'র সাহায্য পেতে চাইলে) অফিসে আবেদন করেন। আলু চাষের জন্য একর প্রতি ১৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বিআরডিবি'র কর্মসূচির আওতায় গ্রামে কৃষক সমবায় সমিতি (১৯৮৪) ও বিত্তহীন সমবায় সমিতি (১৯৮৬) গঠিত হয়েছিল। ভূমিহীন সদস্যগণ প্রতিবারে ৫০০-১,০০০ টাকা ঋণ নিত। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ছিল এক বছর। ১৯৯০ সাল থেকে এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮৮ সালে ব্র্যাক এ গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। গ্রামের ১২৭ টি খানা থেকে ১৫৭ জনকে ব্র্যাক সমিতির সদস্য করা হয়। এর মধ্যে ৬৬ জন মহিলা এবং ৯১ জন পুরুষ। ব্র্যাক এ গ্রামে ক্ষুদ্র ব্যবসা, গাভী পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পরিবহন, গৃহ নির্মাণ, কাঁথা সেলাই প্রভৃতি কাজে ঋণ দিয়েছে। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ব্র্যাক এ গ্রামে ১১,৮৬,৯০৮ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য করা হয়েছে ৬,৮৩,৪৮৮ টাকা এবং পুরুষদের জন্য ৫,০৩,৫০০ টাকা।

১৯৯১ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী কৃষি কাজ, ব্যবসা, টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন ও গৃহ নির্মাণের জন্য কোন প্রকার জামানত ছাড়াই গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পেয়ে থাকে। ঋণের পরিমাণ সর্বনিব ১,০০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা। এ গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের শুধুমাত্র মহিলা সমিতি আছে। এখানে ৩৪টি খানার ৩৪ জন মহিলা গ্রামীণ ব্যাংক সমিতির সদস্য। ১৯৯৩ সালের আগষ্ট মাসের হিসাব অনুযায়ী এ ব্যাংক মোট ১,৬৯,৫০০ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গ্রামের কিছু উৎসাহী লোক নিজেরা সমিতি গঠন করেছে। এ সমিতির সদস্যগণ হলেন কৃষক শ্রেণী ও গরীব রিক্সা চালক দিনমজুর। সমিতির সদস্য ছাড়া, গ্রামের এবং অন্য গ্রামের যে কোন পরিচিত ব্যক্তিও সমিতি থেকে নগদ টাকা কিংবা রিক্সা বন্ধক দিয়ে টাকা নিতে পারে অথবা কিস্তিতে বিক্সার জন্য ঋণ নিতে পারে। কিস্তিতে রিক্সা প্রদানের সময় সমিতি পুরাতন রিক্সার জন্য ২০০ টাকা ও নতুন রিক্সার জন্য ৩০০ টাকা জামানত হিসাবে জমা নেয়।

গ্রামীণ জীবনের সবচেয়ে পরিচিত ও পুরাতন ঋণ ব্যবস্থা মহাজনী কারবার এখনও বিলুপ্ত হয়নি। গ্রামের সকল দরিদ্র লোকই এনজিওদের সদস্য হতে চায় না এবং তাদের কাছ থেকে ঋণ নিতেও আগ্রহী হয় না। ফলে তারাই ঋণের প্রয়োজনে মহাজন কিংবা আত্মীয়-স্বজনের শরণাপন্ন হয়। আবার যারা ব্র্যাক কিংবা গ্রামীণ ব্যাংকের সমিতির সদস্য হয় তাদের অনেকেই ঋণ নিয়ে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করতে না পেরে ঋণের দায় ও দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেয়। ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস মহাজন ছাড়াও গ্রামে আত্মীয় বা বন্ধু থেকে ঋণ গ্রহণ এবং গ্রামের দোকান থেকে বাকীতে বিভিন্ন জিনিষ কিনতে দেখা যায়্

দেখা গেছে, ঋণ যে উদ্দেশ্যে দেয়া হয় গ্রামের লোক সে উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণের টাকা ব্যবহার না করে একাধিক কাজে ব্যবহার করে থাকে। নারায়ণপুর গ্রামে ব্র্যাক সমিতির ১৮ জন সদস্যের বিভিন্ন ধরনের ৪২টি ঋণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ১৬টি ঋণ সরাসরি ভোগে, ১২টি ঋণ পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধে এবং ৭ টি ঋণ ব্র্যাকের কিস্তি প্রদানে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবসায় ৩৩ টি ঋণের মধ্যে ২০টি ঋণ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে দেখা গেলেও এক্ষেত্রে ঋণের পুরো টাকা এ খাতে ব্যয় হয়নি এবং ৩ থেকে ৪ মাসের বেশি ব্যবসা চালাতে পারেনি। দেখা গেছে, গৃহ নির্মাণের জন্য ৫টি ঋণের ৩টি দিয়ে গৃহ নির্মাণ করলেও অন্য দুটো ঋণ বাড়ির ভিটে ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেখা গেছে, যারা পূর্বে শুধুমাত্র কৃষি দিনমজুরীর উপর নির্ভরশীল ছিল তারা এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে নতুন নতুন পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। ফলে গ্রামে আগের মত শ্রমিক সরবরাহ নেই। যে সকল মহিলারা গৃহকর্ম ছাড়া অন্য কোন আয় বৃদ্ধিমূলক পেশার সাথে জড়িত ছিল না তারা বর্তমানে স্বামীর পেশাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেও বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে জড়িত হয়েছে। উচ্চ-ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ ঋণ যথেষ্ঠ সহায়তা করেছে, ফলে অনেক কৃষকই লাভবান হয়েছে। ঋণ নিয়ে অনেকেই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সাইকেল, কর্মসংস্থানের জন্য রিক্সা ক্রয় করেছে। গরু, ছাগল অথবা জমি কেনা ছাড়াও অনেকে টিনের ঘর তৈরি করেছে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি কিনেছে।

উপসংহার

দেখা গেছে, ঋণ নিয়ে সবাই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। যাদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল তারাই ঋণ নিয়ে উন্নতি করতে পেরেছেন। অন্যদিকে, যে সকল মহিলারা ঋণ নিয়ে স্বামীর কাজের সাথে সাথে নিজেও ধান চালের ব্যবসা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন করে তাদের ক্ষেত্রেও ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেদের পেশাগত আয় থেকে কখনই ভিটেবাড়ি, জমি, ঘর কিংবা টিউবওয়েলের মালিক হতে পারতোনা তাদের পক্ষে ঋণের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে।

আবার এমন অনেক লোকও আছে যারা ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সম্পদ হারিয়েছে। এর কারণ জানতে গিয়ে জানা গেছে, তারা উৎপাদনমূলক কাজে ঋণ ব্যবহার করতে পারেনি। নারায়নপুর গ্রামে ঋণের ক্ষেত্রে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ছাড়াও গ্রাম্য সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যদিও মহাজনী ঋণ গ্রহণের হার আশানুরূপ হারে হ্রাস পায়নি। ঋণের নেতিবাচক প্রভাব থাকলেও গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এবং উন্নয়নে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কাজের সময়, আয় ও ব্যয়ের ঋতুভিত্তিক তারতম্যঃ একটি সমীক্ষা*

মোঃ রাফি

বাংলাদেশের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মধ্যে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) অন্যতম। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্র্যাকের আরডিপি ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ২০,১৪১ টি গ্রাম সংগঠনের ৮,২৫,৭৯০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ৩৬৭ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে। এ ঋণ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটা প্রভাব ফেলেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি সমীক্ষা চালায়।

এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ দু'টি। প্রথমত ভূমিহীন শ্রমজীবিদের শ্রমদান, আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মওসুম কোন বাধা কিনা তা দেখা। দ্বিতীয়তঃ কৃষি মওসুমের সংগে এসব ভূমিহীন শ্রমজীবিদের আয় ও ব্যয় কতটা সম্পর্কযুক্ত তা দেখা।

গবেষণা পদ্ধতি

এ সমীক্ষার জন্য ভূমিহীন শ্রমজীবিদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করে নেয়া হয়। প্রথম গ্রুপ হল যারা ব্র্যাকের আরডিপি'র সদস্য, দ্বিতীয়টি হল কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ব্র্যাকের সদস্য হতে পারে কিন্তু এখনও সদস্য হয়নি (অসদস্য) এবং তৃতীয় গ্রুপ হল যারা ব্র্যাকের সদস্য হতে পারে অথচ সে এলাকায় আরডিপি'র কর্মসূচি নেই বলে হতে পারছেনা (কন্ট্রোল)। এ রকম তিন শ্রেণীর খানা থেকে ৩২১ টি খানা বাছাই করা হয়। এর মধ্যে আরডিপির সদস্য ১১৯ টি, অসদস্য ১১৯ টি ও কন্ট্রোল ৮৩ টি খানা।

---

* Summary of the RED research report entitled "A study on the seasonal variation in hours worked, income and expenditure" by Mohammad Rafi. 1994. 46p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Uullah)

গবেষণার ফলাফল

সমীক্ষা চলাকালীন সময়ে দেখা গেছে যে, ব্র্যাকের আরডিপির সদস্যদের মাঝেই শ্রমজীবির সংখ্যা বেশি, গড়ে ৫,০৯ জন সদস্য প্রতি খানায়। অন্য দুই গ্রুপের তুলনায় তারাই বেশি শ্রমঘন্টা কাজ করে থাকে। আবার তাদের খানা প্রধানরাই গড়ে দৈনিক বেশি কাজ করে থাকেন। অপর দিকে, কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (কন্ট্রোল) মাঝে শ্রমজীবির সংখ্যা সবচেয়ে কম এবং তারাই সবচেয়ে কম শ্রমঘন্টা কাজ করে থাকেন। ১৫ দিনের গড় হিসাবেও একই তথ্য পাওয়া যায়। কারণ ব্র্যাক সদস্যরা তখন ব্র্যাকের আরডিপি থেকে ঋণ পেয়েছে এবং বেশি কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

১৯৯১-এর জুন-জুলাই মাসে আরডিপিভুক্ত খানার সদস্য অধিকতর বেশি সময় কাজ করে। ১৯৯১-এ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে কন্ট্রোল, অসদস্য ও সদস্যদের কাজের সময় অন্যান্য মাসের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ১৯৯১ ও ১৯৯২- এর এপ্রিল-জুলাই এবং ১৯৯২ এর নভেম্বর-জানুয়ারি মাসে সকলের কাজের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এ সময় ফসল ওঠে। ফসল ওঠার এ সময়কে ভরা মৌসুম বলা হয়।

অকৃষিখাতে ব্র্যাকের সদস্য নয় এমন লোকেরা বেশি শ্রম দেয়। এ খাতে কন্ট্রোল এলাকার লোকেরা সবচেয়ে কম শ্রম দেয়। ১৯৯১-এর এপ্রিল মাসে দেখা গেছে, কন্ট্রোল এলাকার দরিদ্র লোকেরা অকৃষিখাতে যত ঘন্টা শ্রম দিয়েছে এবং কৃষিখাতে দিয়েছে তার কয়েকগুণ কম। তবে সাধারণত কন্ট্রোল খানার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যখন যে কাজ বেশি পায় তখন তারা সে কাজ করে।

আয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ১৫ দিনে গড়ে কর্মসূচিভুক্ত এলাকার অসদস্য পরিবারের আয় সবচেয়ে বেশি (৮১৮.৩৮ টাকা) এবং কন্ট্রোল পরিবারের আয় সবচেয়ে কম (৪৬৪.০৯ টাকা)। আবার শষ্য বিক্রি থেকে আয় বেশি হয়েছে ব্র্যাক সদস্যদের (১০৩.৮৬ টাকা) এবং সবচেয়ে কম আয় হয়েছে কন্ট্রোল গ্রুপের (২৮.১২ টাকা)। অধিকাংশ মাসেই আয় কম হলেও ১৯৯১-এর জুনে কন্ট্রোল পরিবারের আয় হয় ৪৫৬.১৯ টাকা। এ মাসে আয় বৃদ্ধি মূলতঃ শষ্য বিক্রি থেকেই হয়েছে। সমীক্ষার সময় থেকে এক মাসে

দেখা গেছে, ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্যের শষ্য বিক্রি থেকে যথাক্রমে, ১.৫ ও ২.০০ টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কন্ট্রোল পরিবারের আয় এক টাকা হ্রাস পেয়েছে। দেখা গেছে, ১৯৯১ ও ১৯৯২- এর এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মার্চ, এপ্রিল ও জুলাই-আগষ্ট মাসে সব গোষ্ঠীরই আয় কমেছে। কৃষি ও অকৃষি খাতে দিনমজুরী করে আয় করে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্র্যাক সদস্য, অসদস্য ও কন্ট্রোলের মধ্যে সদস্য সবচেয়ে বেশি আয় করেছে এবং অসদস্য সবচেয়ে কম আয় করেছে। দেখা গেছে, ১৯৯১- এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের আয়ের তুলনায় ১৯৯২- এর সমীক্ষাকালীন মাসে আয় কম। ফসল ওঠার সময় আয় বেশি হয়। ভরা মৌসুমে দিনমজুরদের আয় ছিল বেশি। পক্ষান্তরে মন্দা মৌসুমে কৃষি দিনমজুরদের চাহিদা অতটা না থাকায় আয় কমেছে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কন্ট্রোল পরিবার অন্যান্য গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি আয় করেছে। তবে ব্যবসায়িক আয় ও ফসল ওঠার সময়ের সাথে সম্পর্কিত।

সকল পরিবারের খাদ্য বাবদ ব্যয় নির্ভর করে ফসল ওঠার সময়ের উপর। ১৯৯১-এর এপ্রিলে দেখা গেছে, ব্র্যাক সদস্য, অসদস্য ও কন্ট্রোল সকলেই শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ খাদ্য বাবদ ব্যয় করেছে। অবশ্য প্রতি মাসেই অর্থ ব্যয়ের হ্রাস বৃদ্ধির সাথে ফসল ওঠার সময়ের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না।

যেসব খাবার খাওয়ার অভ্যাস সহজে পরিবর্তন করা যায় না যেমন, চাল, লবণ ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ে যখন তখন ওঠানামা করেনা।

উপসংহার

দেখা গেছে, ব্র্যাক সদস্য সবচেয়ে বেশি ও কন্ট্রোল খানা সবচেয়ে কম সময় কাজ করেছে। আবার যদি ব্র্যাক সদস্য, অসদস্য ও কন্ট্রোল সবাই অকৃষিখাতে বেশি সময় কাজ করেছে কিন্তু ফসল লাগানো ও ফলস উঠার সময় সব গোষ্ঠীই কৃষিখাতে বেশি সময় দেয়। এই তিনটি গোষ্ঠী জীবন ধারনের জন্য কৃষির চেয়ে অকৃষিভিত্তিক কাজের উপর বেশি নির্ভরশীল। এক কথায় বলা যায়, শষ্য উঠার ঋতুর উপর নির্ভর

করে কাজের সময় ব্যয়, আয় ও নগদ অর্থ ব্যয় ইত্যাদি। দেখা গেছে, সময়ের সাথে সাথে কন্ট্রোল খানার অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা ধীরে ধীরে নাজুক হয়ে পড়েছে।

ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অপ্রচলিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ*

সামিহা হুদা ও নাওমী হোসেন

ভূমিকা

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মহিলাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং ঋণের অভাবে ও পর্দা প্রথার কারণে তাদের অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এমন কি তাদের সামাজিক জীবনও নানা সমস্যায় জর্জরিত।

সেলিনা নামের ১৬ বছরের একজন প্রশিক্ষণার্থী কাঠমিস্ত্রি বলেন, একটি মেয়ে যখন তার পিতামাতার বাড়িতে থাকে তখন পিতামাতার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা, যখন তার স্বামীর বাড়িতে থাকে তখন স্বামীর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। যখন প্রশ্ন করা হয় তাহলে কোন বাড়িতে নিজের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা? তখন উত্তর আসে আল্লাহর বাড়িতে। এ অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা যায় আমাদের দরিদ্র গ্রামীণ সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়।

দারিদ্র্য এবং মৌলিক মানবিক প্রয়োজনেই মহিলারা কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যেতে শুরু করেছেন। প্রচলিত ধারনা, রক্ষণশীল মনোভাব এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুভূতি উপেক্ষা করে তারা এখন বাড়ির বাইরে কাজ করতে শুরু করছেন এবং এটাকেও অপ্রচলিত বিষয় বলে ধরা যেতে পারে। এসব কারণেই ব্র্যাক পল্লীর দরিদ্র মহিলাদেরকে বিভিন্ন আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সহায়তা করছে। মহিলারা যাতে সরাসরি উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে তার

* Summary of the RED research report entitled “Involvement in non-traditional activities: the implications for women’s empowerment” by Samiha Huda and Naomi Hossain. 1994. (Summarized in Bangla by DK Fuad Hasan)

সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই ব্র্যাক এ সহায়তা দিচ্ছে। দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুস্থ মহিলাদের জন্য ব্র্যাক বেশ কিছু আয়মূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেমন-হাঁস-মুরগী পালন, কাঠের কাজ এবং নকশীকাঁথা তৈরী।

উদ্দেশ্য

এ সমীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্র্যাক পরিচালিত প্রচলিত অপ্রচলিত আয়মূলক কর্মকান্ড বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা। যে দুটি বিষেয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে তা হলো মহিলাদের ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝায়, এবং অপ্রচলিত কাজে অংশগ্রহণের ফলে মহিলাদের জীবনে এর কী প্রভাব পড়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মহিলাদের জীবন যাত্রা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এ গবেষণার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। জামালপুর এলাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। বিভিন্ন আয়মূলক প্রকল্প যেমন কাঁথা সেলাই, হাঁস-মুরগী পালন, সবজী উৎপাদন ও ধান ভানার কাজে নিয়োজিত কয়েকজন মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এসব সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কেসস্টাডির জন্য মহিলাদের নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও ব্র্যাক মহিলাদের জন্য কী করতে পারে এ সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং তাদের জীবনে ব্র্যাকের কর্মকান্ডের প্রভাব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়।

এসব মহিলাদের মধ্যে ছিলেন নকশীকাঁথার কাজে জড়িত চারজন ব্র্যাক সদস্য ও একজন অসদস্য। হাঁস-মুরগী পালনে জড়িত চারজন ব্র্যাক সদস্য ও একজন অসদস্য এবং কাঠমিস্ত্রীর কাজে জড়িত তিনজন ব্র্যাক বহির্ভূত মহিলা, তবে এরা ব্র্যাক এর এসএফপিই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সাধারণতঃ ঘরের বাইরে যেতে হয়না। হাঁস-মুরগী পালনকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কাজ বলেই গন্য করা হয়। হাঁস-মুরগী পালনকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কাজ বলেই গন্য করা হয়। নকশীকাঁথার কাজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত কাজ বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে

তবে ব্র্যাক এর আওতায় একাজে অংশগ্রহণ করলে সাধারণতঃ বাড়ির বাইরে যেতে হয়। বাড়ির কাজ অথবা 'সৃজনী কর্মসূচি' সকল অর্থেই প্রচলিত কাজ।

আলোচনা

যে সব মহিলা আয়মূলক কার্যক্রমে জড়িত তারা সাধারণতঃ অত্যন্ত দরিদ্র এবং স্বামীর (যে ক্ষেত্রে উপার্জনে সক্ষম স্বামী আছে) উপার্জন ছাড়াও তাদের অতিরিক্ত আয় প্রয়োজন। অনেক মহিলাই মনে করেন ব্র্যাক তাদেরকে নিস্বঃ অবস্থা থেকে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছে। একারণে মহিলারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন গতিশীলতা পরিমাপ করার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ক্রয়ক্ষমতা, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, পারিবারিক নিগ্রহ এবং শাসন থেকে স্বাধীনতা, রাজনৈতিক এবং আইনগত সচেতনতা, গণপ্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক প্রচারনায় অংশগ্রহণ- এধরনের সূচকগুলি ব্যবহার করা যায় এবং আমরা এখানে আমাদের প্রাপ্ত তথ্যগুলো এসব সূচকের ভিত্তিতেই পরিমাপ করেছি।

আমরা প্রথমেই পরীক্ষা করি যে অপ্রচলিত আয়মূলক কর্মকান্ড প্রচলিত আয়মূলক কর্মকান্ডের চাইতে বেশি ক্ষমতায়ন করে। এর মধ্যে রয়েছে, মহিলারা যখন কোন অতিরিক্ত কাজ হাতে নেন, বিশেষ করে গৃহাস্থলির কাজের কোন ব্যবস্থা ছাড়াই তারা যখন অন্য কাজের জন্য ঘরের বইরে যান তখন তারা অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন হন। কাঠের কাজের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সামাজিক চাপ লক্ষ্য করা যায়। তারা একটি মৌলিক উদ্ভাবনী প্রকল্পের প্রথম কর্মী যারা এ সামাজিক চাপের মোকাবেলা করছেন।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাই মহিলাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহিলা সংশিষ্ট যে কোন আয়মূলক কর্মসূচি যতক্ষন পর্যন্ত লাভজনক ততক্ষন পর্যন্ত তা টিকে থাকবে। সুতরাং মহিলাদের ক্ষমতায়ন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল।

এটা পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক লাভই এ ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রেরণা দেয়। এ ধরনের নিরাপত্তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ে মহিলাদের অতি সামান্যই আগ্রহ থাকে। আবার প্রচলিত রীতিতে

ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারা সুবিধা লাভ করছেন, যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদি।

পরিবারের সদস্য ও ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য সামাজিক চাপ মহিলাদের অপ্রচলিত কাজে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। যদিও সামাজিক অস্বীকৃতি অপ্রচলিত কাজের একটি প্রধান বাধা তথাপি অনেক মহিলাই তাদের নিজেদের এবং অন্যান্য মহিলাদের কাজে এ ধরনের অপ্রচলিত কাজের অস্বীকৃতি জানান। বিশেষ করে একটি সাধারণ ধারণা হলো কাজ না করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারলে মহিলারা কাজ করেন না।

উপসংহার

আমাদের পর্যবেক্ষণে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করা যায়, তবে এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

১. মহিলাদের কাছে মুখ্য বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা
২. কিছু মহিলা নিয়মিত দুটি কাজ করছেন। ফলে হয় নিজেরা অতিরিক্ত কাজের চাপে ভারাক্রান্ত অথবা গৃহাস্থলির কাজে শিশুদেরকে ভারাক্রান্ত করছেন।
৩. ব্র্যাকের মহিলা সদস্যদের শিক্ষার উপরে বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দিতে দেখা যায়।
৪. পুরুষের কাজ হিসেবে প্রচলিত কাঠমিস্ত্রির কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের কাছ থেকেই বাধা লক্ষ্য করা যায়।
৫. হাঁস-মুরগী পালনকারীরা বাজারজাতকরণের প্রয়োজনে বাজারে প্রবেশে বাধার সম্মুখীন হন। অন্য দু'টি কর্মসূচিতে গতিশীলতার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধা লক্ষ্য করা যায়নি।
৬. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের খানায় নারী-পুরুষ আন্তঃসম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়েনি। স্ত্রীর উপর স্বামীর আর্থিক নির্ভরতা নারী-পুরুষ সম্পর্ক নির্ধারণে সকল ক্ষেত্রে

না হলেও একটি কার্যকরণ হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে, খানায় দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যয়, পারিবারিক গোলযোগ নিরসন এবং গৃহাস্থলির কাজ বন্টন।

৭. শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই মহিলারা কাজ করেন এবং প্রয়োজন না হলে (বাড়ির বাইরে) তারা কাজ না করাটাই পছন্দ করেন।

সুপারিশ

মহিলাদের জন্য প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্র্যাক এর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। মহিলাদের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ধারণার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন যে আমাদের টার্গেট গ্রুপ-এর ক্ষমতায়ন কিভাবে হবে। এছাড়াও মৌলিক উদ্ভাবনী প্রকল্প যেগুলো সমাজে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে এবং যেসব প্রকল্পে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক সেগুলোর প্রতি জোর না দিয়ে বরং যেসব প্রকল্প আমাদের সদস্যদের প্রয়োজন তাদের চাহিদা এবং স্বার্থ রক্ষা করবে সেগুলোর দিকেই বেশি জোর দেয়া উচিত। মহিলাদের ক্ষমতায়নে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়।

মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত প্রকল্প/ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে সফল এবং টিকে থাকতে হবে। মহিলাদেরকে যখন নতুন কর্মক্ষেত্রে (পুরুষ নিয়ন্ত্রিত) নিয়ে যাওয়া হবে তখন তা এমনভাবে করতে হবে যা তাদের জন্য উপকারী হবে। এক্ষেত্রে তাদের গৃহাস্থালীর কাজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং শুধুমাত্র আয়ের জন্য একজন মহিলাকে পুরুষে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

কর্মসূচিগুলো আরও নমনীয়ভাবে পরিচালনা করা যায়। সৃজনশীল কার্যক্রম যদি সফল করে তুলতে হয় তাহলে এতে সঞ্চয় কার্যক্রমসহ কতিপয় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। হাঁস-মুরগী পালনকারীদের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় জড়িত করা এবং তাদেরকে হাঁস-মুরগী পালনের অন্যান্য দিক সম্পর্কেও অবহিত করা প্রয়োজন।

মহিলাপ্রধান খানায় কী কী করণে মহিলারা ঝুঁকির সম্মুখীন হন?*

নাওমী হোসেন ও সামিহা হুদা

আমাদের গ্রামীণ সমাজের মহিলাপ্রধান খানা নিয়ে যথেষ্ট সমীক্ষা হয়নি। বেশির ভাগ খানার প্রধান পুরষ এবং তারাই খানার আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। সম্ভাবত এ ধারণার জন্যই মহিলাপ্রধান খানা নিয়ে যথেষ্ট সমীক্ষা হয়নি। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, সার্বিকভাবে পল্লী এলাকায় ১৫% খানার প্রধান মহিলা এবং ভূমিহীন পরিবারগুলোর ২৫% খানা প্রধান হচ্ছেন মহিলা। ভূমিহীন পরিবারের মহিলাপ্রধান খানাগুলোর পরিসংখ্যান এবং এদেশে মহিলাদের সাধারণ অবস্থার যে কোন পর্যালোচনায় এটা ধারণা করা যায় যে মহিলাপ্রধান খানা, পুরষপ্রধান খানার চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিশি ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে মহিলাপ্রধান খানাগুলো ব্র্যাক-এর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

এ সমীক্ষার প্রধান বিষয় হচ্ছে মহিলাপ্রধান খানায় কোন ধরণের ঝুঁকি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা। এসব মহিরা যেসব ক্ষেত্রে নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে তা হচ্ছে আর্থ–সামিজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। কাজেই খানা প্রধান এসব মহিলা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা পরীক্ষা করা এবং যেসব ক্ষেত্রে নাজুক পরিস্তিতির সম্মুখীন হচ্ছেন তা পরীক্ষা করা এবং যেসব ক্ষেত্রে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলো চিহ্নিত করাই এ গবেষণার লক্ষ। এ ক্ষেত্রে খানার মহিলাপ্রধান হিসেবে পূর্ণ বয়স্কা মহিলাকেই বুঝানো হচেছ যার স্বামী স্থায়ীভাবে অথবা দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন।

মতলব থানার উদ্দমদি গ্রামে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে (১৯৯৪) সেখানে ৪১ জন মহিলা খানাপ্রধান রয়েছেন যাদের মধ্যে ৩২ জনের সাক্ষৎকার গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ জরিপের পর যেসব মহিলার স্বামী ফিরে এসেছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে এবং একই সময়ে যেসব মহিলা বিধবা হয়েছেন অথবা গ্রামে ফিরে এসেছেন তাদেরকে সমীক্ষার আওতায় আনা হয়। এদের স্বামীরা স্থায়ীভাবে অথবা

---

* Summary of the RED research report entitled ‘Risk factors for women headed households: what makes them vulnerable? A study examining the problems faced by women-headed households in a village in Matlab, Chandpur’ by Naomi Hossain and Samiha Huda. 1994. 29p. (Summarized in Bangla by DK Fuad Hassan)

দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত। অন্যান্য মূল তথ্য প্রদানকারীরা ছিলেন গ্রামবাসীরা যারা এসব মহিলাদের প্রতি তাদের আচরণ এবং ধারণা জানতে আমাদেরকে সাহায্য করেন। কয়েকজন মহিলাকে তাদের কাজের সময়ে উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং গ্রাম সমিতির সভায় তাদের আচরণ র্পবেক্ষণ করা হয়। মহিলারা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা লাভের জন্য ১০ জন মহিলার কয়েক দফা ফলোআপ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

যেসব মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের ১৪ জন বিধবা, ১৩ জনের স্বামী বাইরে কাজ করেন এবং ৫ জন স্বামী পরিত্যাক্তা। পরিত্যাক্তাদের মধ্যে দুজন মহিলা তাদের স্বামী আবার বিয়ে করায় স্বামীকে পরিত্যাগ করেছেন। আবার এসব মহিলার অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদেরকে দুঃস্থ, প্রান্তিক, স্বচ্ছল এবং ধনাঢ্য শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে।

ফলাফল

এ সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মহিলাপ্রধান খানার গুরুতর সমস্যাটি হচ্ছে দারিদ্র্য। তবে এ দারিদ্র্য সকল ক্ষেত্রে এক নয়। প্রকৃতপক্ষে এ দারিদ্র্য পরিত্যাক্ত এবং বিধবাদের অথবা যারা স্থায়ীভাবে খানাপ্রধান তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাইরে কর্মরত শ্রমিকদের স্ত্রীগণ অথবা কার্যতঃ খানাপ্রধানদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো।

অত্যন্ত দরিদ্র কয়েকজন মহিলা জীবনধারণের জন্য ভিক্ষা করে থাকেন এবং তারা সাধারণতঃ প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের দানের উপর নির্ভরশীল। অন্য কয়েকজন অন্যের বাড়িতে , হোটেলে অথবা মাটিকাটা কাজ করেন। অন্যদিকে কয়েকজন ধনী ব্যক্তির বিধবা পত্নিরা রয়েছেন, যাদের রয়েছে অনেক ভূসম্পত্তি, তাদের কোন আর্থিক দুশ্চিন্তা নেই। যেসব মহিলার স্বামী বাইরে কাজ করেন তাদের জীবনযাত্রা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ। কারণ তাদের একটি নিয়মিত আয় রয়েছে।

মহিলাদের আয় ও সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত নগন্য। দেখা গেছে, জমি বর্গা দেয়ার ব্যাপারে মহিলা খানা প্রধানরা বাইরের লোকদের হাতে না দিয়ে এর ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব অনেক দূরে অবস্থানকারী স্বামী অথবা অন্য পুরুষ আত্মীয়দের হাতে ন্যস্ত করেছেন।

এ ছাড়া মহিলা খানা প্রধানরা কি পরিমাণ জমির মালিক তা জানতে অপারগতা (সম্ভবত: অনিচ্ছা) প্রকাশ করেছেন। তাদের স্বামীরা কত আয় করেন, এর কি পরিমাণ অংশ তারা গৃহস্থালীর ব্যয় নির্বাহের জন্য পেয়ে থাকেন এবং তাদের জমির জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, এসব বিষয়েও তাদের ধারণা অস্পষ্ট। এর কয়েকটি ব্যতিক্রমও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একজন মহিলা যার স্বামী একাধারে ৮ বছর ধরে অনুপস্থিত তিনি তার সকল কার্যক্রম নিজেই সম্পন্ন করেছেন এবং এজন্য তিনি গর্ববোধ করেন।

এসব মহিলাদের মধ্যে যারা ব্র্যাক সদস্য, তাদের মধ্যে ঋণ গ্রহণে বিমুখতা লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কয়েকজন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্র্যাক সদস্য কিন্তু তারা ঋণ গ্রহণ করেননি এবং ঋণ গ্রহণের জন্য আগ্রহও প্রকাশ করেননি। এটা প্রধানত: নির্দিষ্ট সময়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারা সম্পর্কে মানসিক ভীতির কারণে হয়েছে।

পর্দা প্রথা সংরক্ষণে মহিলাদের ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে। এটা তাদের গতিবিধি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। যেসব মহিলা অত্যন্ত দরিদ্র এবং যাদের দারিদ্র্য সামাজিক অস্বীকৃতিকে ছাপিয়ে যায় তাদের মধ্যেই এ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। মহিলাপ্রধান খানাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব খানায় বসবাসরত অন্য কারো উপর, অথবা খানায় যে কোন সময়ে উপস্থিত একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর বর্তায়।

মহিলা খানা প্রধানরা তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ না থাকার কারণে কিছু ঝুঁকির সম্মুখীন হন। এ বিষয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, যখন তাদের জমি সাধারণের ব্যবহারের জন্য নিয়ে নেয়া হয় অথবা গ্রাম্য শালিশে কোন মহিলার সন্তান তার কাছে থাকবে কি থাকবে না এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তখন তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ না থাকার কারণে তারা কার্যকর প্রতিবাদ জানাতে পারেন না।

মহিলা খানা প্রধানরা বিশেষ ঝুঁকির সম্মুখীন হন। দেখা যায় দরিদ্রতার কারণে তাদের সন্তানরা হয় নিজেরাই অথবা বাধ্য হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের পিতা অথবা আত্মীয়রা তাদেরকে নিয়ে যায়, অথবা তাদেরকে এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আইনগত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতাও মহিলা খানাপ্রধানদের জন্য একটি ঝুঁকির ক্ষেত্রে । জ্ঞানের স্বল্পতা, পক্ষে কথা বলার (পুরুষ) লোকের অভাব এবং মহিলা খানা প্রধান হিসেবে বৈধতার অভাব (যেমন, পুরুষরা স্বাভাবিকভাবে খানার প্রধান এবং অভিভাবক) এর সবগুলোই একজন মহিলা খানা প্রধানের ক্ষমতাহীনতার কারণ।

এছাড়াও মহিলাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে যে, তাদের জন্য সাধারণভাবে অল্পই কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধানিষেধ পার হতে পারুক বা না পারুক কাজটি তাদের জন্য প্রযোজ্য কি না তা বিবেচনা করা হয় না। এছাড়াও মহিলারা অনেকাংশে পুরুষদের চাইতে অদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত, এবং এ কারণেও প্রাপ্ত কাজের অনেকগুলোর জন্যই তারা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না।

মহিলাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা তাদের অর্থনৈতিক ঝুঁকির কারণগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, পর্দাপ্রথা, বয়স এবং অভিভাবক হিসেবে একজন পুরুষের উপর নির্ভরতা এবং একজন পুরুষ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তাহীনতা।

ব্র্যাকের ভূমিকা

এসব ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্র্যাক তার প্যারালিগ্যাল কর্মসূচি দিয়ে মহিলা খানা প্রধানদের সহায়তা করতে পারে। পারিবারিক এবং উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে মহিলাদের জ্ঞান যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক নয়। জমির মালিকানা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ লাভের অধিকার, যৌতুক, সন্তান নিজের কাছে রাখার ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার এবং তালাক, পরিত্যাগ বা স্বামীর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এসব মহিলার অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

মনিটরিং

দেখা গেছে, ব্র্যাকের কর্মসূচির আওতাধীন মহিলা খানাপ্রধানদের ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে যতোটা লাভবান হওয়ার কথা ততোটা হচ্ছেন না। কয়েকটি ক্ষেত্রে দু'বছর পর্যন্ত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম সমিতির বেশ কিছু সদস্য ঋণ গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঋণের কিস্তি পরিশোধ অসুবিধাজনক হয়ে দাড়াবে এ ধারণাই ঋণ গ্রহণে তাদের অনাগ্রহের কারণ। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের মনিটরিং এর প্রয়োজন রয়েছে।

উপরোক্ত তথ্যগুলো একটি প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা খানাপ্রধানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা আরও বিস্তারিতভাবে দেখা যেতে পারে।

মতলব এলাকার আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্পের বেজলাইন জরিপ*

সৈয়দ মাসুদ আহমদ, মোঃ মহসীন, আব্বাস ভূইয়া, আহমেদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী ও একেএম মাসুদ রানা

ব্র্যাক তার জন্মলগ্ন থেকে পল্লীর দুঃস্থ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ব্র্যাকের কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি বা রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরডিপি) ব্র্যাকের প্রধান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ কর্মসূচির আওতায় ব্র্যাক ১৯৮৬ সাল থেকে বহুমুখী সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ঋণ, সঞ্চয়, গ্রাম সংগঠন, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) যা কলেরা হাসপাতাল নামে সমধিক পরিচিত, ১৯৬১ সাল থেকে এদেশে কলেরা ও ডায়রিয়ার উপর গবেষণা চালিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন এ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি শুধু গবেষণাই করছে না, সাথে সাথে এ দেশের জনসাধারণকে বিনামূল্যে এ মারাত্মক রোগের চিকিৎসা দিয়ে আসছে। চাঁদপুর জেলার মতলবে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটির মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড (গবেষণা ও স্বাস্থ্য সেবা) আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুপরিচিত। মতলবে একটি ডায়রিয়া চিকিৎসা কেন্দ্র ও এ এলাকার অন্যত্র স্থানীয়ভাবে পরিচালিত তিনটি উপ-কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে মূলতঃ ডায়রিয়ার চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া মা এবং শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবাও দেয়া হয়। গবেষণার সুবিধার্থে তাদের রয়েছে এক বিশাল ডাটা ব্যাংক যা Demographic Surveillance System বা DSS নামে পরিচিত। এই বিশাল তথ্য ভান্ডারে আছে নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের সম্পূর্ণ তথ্য, যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এলাকা ত্যাগ বা নতুন আগমন, ইত্যাদি। এ ধরনের একটি বিশাল উপাত্ত সংগ্রহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মতলবের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অত্র এলাকায় তেমন একটা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না হলেও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রমগুলো সফলতা লাভ করেছে। এতকিছু স্বত্বেও দরিদ্র পরিবারগুলোর মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অবস্থা খুবই খারাপ। তাই স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে, মতলবে এরই পাশাপাশি যদি একটি সমন্বিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম চালানো যেত তাহলে কি জনগণ এ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সুফল আরো বেশি পেত?

এখন পর্যন্ত মতলবে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের কার্যক্রম স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজকাল মনে করা হচ্ছে যে শুধু স্বাস্থ্যসেবা দিলেই হবে না, এর যথাযথ কার্যকারিতার জন্য চাই বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এ কাজে আইসিডিডিআর,বি-এর তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু ব্র্যাকের রয়েছে দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

ব্র্যাক ১৯৯২ সালে মতলবে আরডিপি'র একটি শাখা খোলে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রম হাতে নেয়। ফলে অত্র এলাকায় গবেষণার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ বিরাট সুযোগটি ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি একত্রে কাজে লাগানোর জন্য একটি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়। ব্র্যাকের সুচিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অত্র এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও সার্বিক উন্নয়নে কতটা প্রভাব রাখছে তা খতিয়ে দেখাই এ যৌথ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেজলাইন জরিপের উদ্দেশ্য

তৃণমূল পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রয়োজন। তারই ভিত্তিতে এ বেজলাইন জরিপ পরিচালিত হয়। মতলবে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হওয়ার পূর্বে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির মান কেমন ছিল তা দেখা এ জরিপের অন্যতম

* Summary of the research report entitled "Baseline survey Matlab, 1992" by Syed Masud Ahmed, et. al. 1994 May. 108p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও পরবর্তীতে তুলনামূলক সমীক্ষা পরিচালনার জন্য সংগৃহীত তথ্য সূচক হিসাবে ব্যবহার করাও এ জরিপের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

অসংখ্য খাল ও বিল বিধৌত এ ছোট ব-দ্বীপটির অধিকাংশ এলাকাই বর্ষার মৌসুমে প্লাবিত থাকে। আইসিডিডিআর,বি-র DSS এলাকাধীন ৬০ টি গ্রামের উপর এ সমীক্ষা চালানো হয়। খানার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১১,৩৪৩ টি খানাকে বেছে নেয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ১০,৯২০ জন বর্তমানে বিবাহিতা নারী, ৯,২৯৪ জন বিবাহিত পুরুষ ও ১০,৯২৬ জন শিশুকে বাছাই করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৯০% নারী, ৬৮% পুরুষ এবং ৯৭% শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ফলাফল

সমীক্ষাধীন এলাকার অধিকাংশ আবাদী জমি বর্ষার সময় পানির নীচে ডুবে যায়, ফসলাদি বিনষ্ট হয়। তখন দারিদ্র্য আরো প্রকট আকার ধারণ করে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট এ মানুষগুলোর অধিকাংশই ছোট ছোট কুড়ে ঘরের মালিক। এক বা দুই কক্ষ বিশিষ্ট এ ঘরগুলোতে গড়ে ৫-৬ জন লোক বাস করে।

সমীক্ষাভুক্ত পরিবারের সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের বয়স ছিল পনের বছরের কম এবং শতকরা ১০ জনের বয়স ছিল ৬০ বছরের বেশি। ব্র্যাক লক্ষ্য বহির্ভূত খানার চেয়ে লক্ষীভূত খানায় অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। পেশার ব্যাপারে, ব্র্যাক লক্ষীভূতদের মধ্যে শ্রমিক ও দিনমজুর এবং লক্ষ্যবহির্ভূতদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি বেশি দেখা গেছে।

ব্র্যাক লক্ষীভূত ও লক্ষ্যবহির্ভূতদের অধিকাংশ খানাই নলকূপের পানি পান করে। দু'ধরনের খানার অধিকাংশই গোসল, হাড়িপাতিল ধোয়া ও রান্নাবান্নার জন্য পুকুরের পানি ব্যবহার করে। লক্ষীভূত খানার মহিলা পুরুষ উভয়কেই অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে আইসিডিডিআর,বি

কার্যক্রম এলাকায় স্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহারের হার একটু বেশি। ব্র্যাক লক্ষীভূত খানার চেয়ে লক্ষ্যবহির্ভূতদের আয়ের উৎস বেশি পাওয়া গেছে। লক্ষীভূত খানায় খাদ্য ঘাটতি আর লক্ষ্যবহির্ভূতদের খানায় খাদ্যের উদ্বৃত্ত থাকে।

সমীক্ষাধীন পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য

শতকরা ৩০ জন উত্তরদাতাই বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ থাকে যাদের মধ্যে ব্র্যাকের লক্ষীভূত গোষ্ঠীর হার বেশি। দেখা গেছে, ব্র্যাক লক্ষীভূত গোষ্ঠীর ৫০.৬% ও লক্ষ্যবহির্ভূতদের ৪৫% মলত্যাগের পর শুধু পানি দিয়ে হাত ধোয়। অধিকাংশ উত্তরদাতাই জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে কিন্তু ব্র্যাক লক্ষ্যবহির্ভূতদের মধ্যেই কনডম ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা গেছে।

অধিকাংশ উত্তরদাতাদেরই বর্তমানে চারটি সন্তান রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই ব্র্যাক লক্ষীভূত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দেখা গেছে, ব্র্যাক লক্ষীভূত গোষ্ঠীর অধিক সন্তানের চাহিদা রয়েছে। ব্র্যাক লক্ষীভূত গোষ্ঠীই লক্ষ্যবহির্ভূত গোষ্ঠীর চেয়ে সন্তানের বিয়ের সময় বেশি যৌতুক দিয়েছে এবং গ্রহণ করেছে।

আয় উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাক লক্ষীভূত গোষ্ঠীর চেয়ে লক্ষ্যবহির্ভূতদের বেশি প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং লক্ষ্যবহির্ভূত গোষ্ঠীই এ প্রশিক্ষণের দ্বারা বেশি উপকৃত হয়েছে।

সমীক্ষাধীন নারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য

জন্ম বিরতিকরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্র্যাকের লক্ষীভূত গোষ্ঠী লাইগেশন ও ইনজেক্শন বেশি ব্যবহার করে এবং লক্ষবহির্ভূত গোষ্ঠী বড়ি বেশি ব্যবহার করে। লক্ষীভূত ও লক্ষ্যবহির্ভূত উভয় গোষ্ঠীরই ৪০% আরো অধিক সন্তানের প্রত্যাশী। সকলের মধ্যেই কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা বেশি।

পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার হিসাবে মেয়েদের ন্যায্য অংশ পাওয়ার পক্ষে লক্ষবহির্ভূত গোষ্ঠী লক্ষীভূতদের চেয়ে বেশি মত দিয়েছে। তবে উভয় গোষ্ঠীর অধিকাংশই মেয়েদের চাকুরি কিংবা অন্য কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের লক্ষীভূত গোষ্ঠীই যৌতুক প্রদান কিংবা গ্রহণ করেছে বেশি। দেখা যায় লক্ষীভূত গোষ্ঠী লক্ষ্যবহির্ভূত গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি ঋণী। তালাকের আইনগত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লক্ষ্য বহির্ভূতদের মধ্যেই বেশি আছে। অন্যান্যদের ধারণা, তিনবার তালাক শব্দটি উচ্চারণ করলেই বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকরী হয়।

টিকাদানের সঠিক সময় সম্পর্কে মহিলাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয় গোষ্ঠীর অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের টিকা দেয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ব্র্যাকের লক্ষীভূত গোষ্ঠীর মহিলারা অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় আয়মূলক কাজে অধিক হারে জড়িত।

উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, ব্র্যাকের লক্ষ্যবহির্ভূত গোষ্ঠীর চেয়ে লক্ষীভূত গোষ্ঠী সার্বিক দিক দিয়ে বঞ্চিত। উভয় গোষ্ঠীতেই পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ। উভয় গোষ্ঠীরই পুরুষরা শ্রমজীবি এবং মহিলারা গৃহাস্থলীর কাজ করে। সমীক্ষাধীন ৬০টি গ্রামে বর্তমানে বিবাহিত মহিলাদের অতি নগন্য সংখ্যক (৩%) আয়-উপার্জনমূলক কাজে জড়িত। অধিকাংশ খানার সদস্যই নলকূপের পানি পান করলেও সব কিছু ধোয়ার কাজ করে খাল কিংবা পুকুরের পানি দিয়ে। ব্র্যাকের লক্ষীভূত ও লক্ষ্যবহির্ভূত উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই যৌতুক আদান প্রদান হয়। গড়ে প্রায় অর্ধেক দম্পতি জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাংলাদেশ সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি কাজ করলেও ব্র্যাক আইসিডিডিআর,বি-র কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার ছয় বছরের কম বয়সের শতকারা ২০টি শিশুকে টিকা

দান কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। যাদেরকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দেয়ার কথা ছিল অথচ দেয়া হয়নি তারা রাতকানা রোগে ভুগছে।

আশা করা যায়, ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি তার আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, আইন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা উন্নয়নকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মায়েদের ধারণা*

কাওসার আফসানা, শাহ্ নূর মাহমুদ, ফজলুল করিম, নজরুল ইসলাম ও আহমেদ আলী

গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় বিশ্বে প্রতি বছর ৪ লাখ ৬০ হাজার মহিলার মৃত্যু হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের মৃত্যুর হার খুব বেশি। ১৯৮২-৮৩ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি এক লাখ শিশুর জন্মের সময় ৬২৩ জন মা মারা যায়, যা উন্নত বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশি। মূলত নিম্ন মানের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা, প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ না করা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক দুরাবস্থা, অশিক্ষা এবং উচ্চ জন্ম হার এ ধরনের মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

ব্র্যাক মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৮টি ইন্টারভেনশন থানায় শুধু লক্ষীভূত গর্ভবতী মায়েদের জন্য এবং বাকী দুটি পাইলট থানায় সকল মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় গর্ভবতী মায়েদের গর্ভবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং আয়রন বড়ি বিতরণ করা হয়।

দেখা গেছে মাতৃ মৃত্যুহার স্বাস্থ্য সুবিধা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে মায়েরা এ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানে কিনা, তারা এটা কতখানি গ্রহণ করেছে এবং না করে থাকলে কেন করেনি। এ প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে কর্মসূচি এলাকায় সমীক্ষাটি চালানো হয়েছে। সে সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবহার এবং গর্ভকালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মায়েদের চিন্তাভাবনাকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

* Summary of the RED research report entitled 'Mothers' perceptions about maternal health care and their utilization of health services in WHDP by Kaosar Afsana et. al. 1994 February. 69p. (Summarized in Bangla by Shahana Huda)

গবেষণা পদ্ধতি

যে সকল মায়েরা ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের মার্চ পর্যন্ত সন্তান প্রসব করেছেন তাদেরকে এ সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির অধীন ১০টি থানায়, ৩০টি এলাকা ও ১,৫০০টি ইউনিট ছিল। প্রতি থানা থেকে ২টি এলাকা বাছাই করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারীগণ এলাকার প্রতিটি খানায় যান এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য মায়েদেরকে বাছাই করেন। এভাবে মোট ১৮১টি জন মাকে সমীক্ষার জন্য বাছাই করা হয়। এ সমীক্ষাটি ১৯৯৩ সালের এপ্রিল- মে মাসে করা হয়।

ফলাফল

দেখা গেছে পাইলট এলাকায় গর্ভকালীন সেবা ইন্টারভেনশন এলাকার সেবার চেয়ে উন্নত হলেও প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবা দুই এলাকাতেই অপ্রতুল। দু'ধরনের এলাকাতেই লক্ষীভূত মহিলাদের চেয়ে লক্ষ্য বহির্ভূত মহিলারা গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাইলট এলাকার প্রায় সব মহিলাই প্রসব পূর্ব সেবা কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন কিন্তু ইন্টারভেনশন এলাকার ৬০% মহিলা জানেন। পাইলট এলাকার দুই গ্রুপের মহিলারাই সেবা কেন্দ্রের সুযোগ গ্রহণ করে কিন্তু নন-পাইলট এলাকায় এই হার খুব কম। কর্মসূচির একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলারা যেন গর্ভকালীন সময়ে অন্তত তিনবার সেবা কেন্দ্রে আসে। অথচ তারা খুবই কম আসে।

যারা পরীক্ষা করানোর জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসে, তাদের খুব কম সংখ্যকেরই তলপেট পরীক্ষা করা হয়। অথচ ভ্রূনের ও মায়ের সুস্থতা জানার জন্য তলপেট পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে সেবা কেন্দ্রের কর্মীদের ট্রেনিং দেয়া প্রয়োজন। তবে পাইলট ও ইন্টারভেনশন দু ধরনের এলাকাতেই মায়েদের টিকাদান খুব সফলভাবে করা হয়। ইন্টারভেনশেন এলাকায় এ হার ৭৪%। এসব কেন্দ্র যখন খোলা থাকে তখন বেশিরভাগ মহিলারা ঘরের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারে না।

এটা লক্ষণীয় যে, সব এলাকার বেশির ভাগ মহিলার প্রসব নিজেদের বাড়ীতেই হয়েছে। মহিলার শিক্ষা, স্বামীর শিক্ষা, অর্থ বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কে জ্ঞান এক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখে না। বেশির ভাগ মহিলা-ই অদক্ষ ধাত্রীদের সহায়তায় সন্তান প্রসব করে। মহিলারা ব্র্যাকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের সাহায্য নেয় না। কারণ তাদের উপর জনগণের আস্থা কম। অথচ অদক্ষ ধাত্রীদের দ্বারা বাসায় বাচ্চা প্রসব করানো খুব ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু মহিলারা সংসার ছেড়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য হাসপাতালে কাটাতে পারে না, কেউ বা হাসপাতালের খরচ বহন করতে পারে না। এছাড়া প্রচলিত প্রথাও হাসপাতালে যাবার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব রাখে। এসব সমস্যা দূর করতে হলে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে রেফারাল পদ্ধতি চালু করা এবং গ্রামে গ্রামে আরো বেশি লাগসই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা দরকার।

অনেক মহিলাই প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন নয় এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানেও না। তারা শুধু এইটুকু জানে যে, আয়রন খেলে রক্ত হয়। শুধু তাই নয় গর্ভকালীন সময়ের ছোট বা বড় সমস্যা যেমন হাইপারটেনশন, রক্তস্বল্পতা, দীর্ঘ সময় প্রসব ব্যথা, অত্যাধিক রক্তপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মহিলারা স্বাস্থ্য কর্মীদের সাহায্য নেয় না। তারা ঘরেই সনাতন উপায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

গর্ভকালীন সেবার মান উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি সংগঠক এবং ধাত্রীদের ঘন ঘন তদারকি করতে হবে। সেবা কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণে সরঞ্জাম ও ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মসূচি সংগঠকদের ও ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া আবশ্যক, যাতে স্বাস্থ্য সেবা কর্মে তারা আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

এলাকার ম্যানেজারদের উচিৎ নিয়মিত সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করা। এছাড়া গর্ভকালীন সমস্যা সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করার জন্য চলচিত্র সরঞ্জাম ব্যবহার করা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া। এক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় ব্র্যাক এ কাজ সমাধা করতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের পুষ্টিহীনতা ঃ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট*

সৈয়দ মাসুদ আহমদ, এ্যালেনা এ্যাডামস, এ এম আর চৌধুরী ও আব্বাস ভূঁইয়া

বাংলাদেশে বিরাজমান ব্যাপক পুষ্টিহীনতার জন্য সাধারণভাবে চরম দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং দূর্বল স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়ে থাকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পুষ্টিগ্রহণে বঞ্চনার কারণে মহিলারা অধিকহারে পুষ্টিহীনতার শিকার হন। মেয়ে শিশুদের প্রতি বৈষম্য তাদের জন্মের বেশ আগে থেকেই শুরু হয়। এ বৈষম্য তাদের শৈশব ও কৈশরেও অব্যাহত থাকে। তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মাতৃত্বলাভের স্তরে পৌছার আগেই পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। দীর্ঘস্থায়ী পুষ্টিহীনতার ফলে কম ওজনের বাচ্চা জন্মদানের সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশি।

এ সমীক্ষায় বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় সন্তান ধরণক্ষম মহিলাদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার প্রসার তুলে ধরা হয়েছে এবং এর জন্য দায়ী কতগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ নির্ণয় করা হয়েছে। সমীক্ষায় তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনে একটি পুষ্টিসূচক বা BMI (Body Mass Index ev BMI = Wt in KG/Ht^2 in metre) ব্যবহার করা হয়েছে। এই সূচকটি প্রাপ্তবয়স্কদের পুষ্টির অবস্থা পরিমাপের জন্য একটি সাধারণ অথচ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। সমীক্ষায় CED (Chronic Energy Deficiency) বা দীর্ঘস্থায়ী শক্তিহীনতার জন্য এই পুষ্টিসূচক ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭ থেকে ১৮.৪ পর্যন্ত পুষ্টিসূচককে ধরা হয়েছে অল্প CED, ১৬ থেকে ১৬.৯ পর্যন্ত মধ্যম CED এবং ১৬ এর নীচে পুষ্টি সূচককে ধরা হয়েছে মারাত্মক CED এর সূচক হিসেবে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে পুষ্টিহীনতার কারণে মৃত্যু এবং রোগ-বালাই এর ক্ষেত্রে সীমিত উপাত্ত পাওয়া যায়। তবে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, স্বল্প পুষ্টিসূচকের একজন ব্যক্তি রোগে ভোগেন বেশি। তার কর্মদক্ষতা এবং

---

* Summary of the RED research report entitled “Chronic energy deficiency in women from rural Bangladesh: some socioeconomic determinants” by S. Masud Ahmed et. al. 1994. 16p. (Summarized in Bangla by DK Fuad Hasan)

আয় থাকে কম এবং সামাজিক কর্মকান্ডে তার অংশগ্রহণ কম হয়ে থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশে বস্তিবাসীদের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৬ অথবা তার নীচের পুষ্টিসূচকের পুরুষদের ৫৫% সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগের মাসে এক বা একাধিক কর্মদিবস হারিয়েছেন। কিন্তু যাদের পুষ্টিসূচক ১৬ থেকে ১৭ এর মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে এ হার কমে এসেছে ৩৫% এ। স্বল্প পুষ্টিসূচক যেমন রোগের ঝুঁকি বাড়ায় তেমনি দীর্ঘস্থায়ী পীড়াও প্রায়ই স্বল্প পুষ্টিসূচকের কারণেই হয়ে থাকে।

চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় পরিচালিত ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর, বি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের (১৯৯২ সাল) বেজলাইন উপাত্ত এ সমীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে মতলবের ১০০ টি গ্রামে ব্র্যাক-এর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) সম্প্রসারণের পর, পল্লীর দরিদ্রদের স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থার সংগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর, বি-র মধ্যে যৌথ গবেষণা সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আইসিডিডিআর, বি-র জনমিতি পর্যবেক্ষণ (Demographic Surviellance System) এলাকার ব্র্যাক অন্তর্ভুক্ত ও ব্র্যাক বহির্ভূত কতগুলো গ্রামের ১১,৩৪৩ টি খানার উপর বেজলাইন জরিপ করা হয়। জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্য থেকে ১৫-৪৯ বছর গর্ভবতী নন এমন ১,৪৬২ জন বিবাহিত মহিলা বাছাই করে দেহমিতি (Anthropometry) উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এখানে ব্র্যাক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন খানাগুলোকে দরিদ্রতম আর্থ-সামাজিক গ্রুপ এবং যেসব খানা আরডিপি কর্মসূচিতে যোগদানের যোগ্য নয় সেগুলোকে ভালো অবস্থার খানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভালো অবস্থার খানাগুলোর মহিলাদের তুলনায় দরিদ্র খানার মহিলাদের পুষ্টিসূচক সবসময়ই কম পাওয়া গেছে। ভালো অবস্থার খানার মহিলাদের গড় ওজন যেখানে পাওয়া গেছে ৪৩ কেজি সেখানে দরিদ্র মহিলাদের গড় ওজন পাওয়া গেছে ৪১.২ কেজি এবং উচ্চতা ১৪৯.৭ সেন্টিমিটারের তুলনায় ১৪৯.১ সেন্টিমিটার। বাহুর মাপ ২২.৭ সেন্টিমিটারের তুলনায় ২১.১ সেন্টিমিটার এবং পুষ্টি ১৯.১- এর তুলনায় ১৮.৫ পাওয়া গেছে। ভালো অবস্থার খানাগুলোর মহিলারা যেখানে গড়ে ১ বছর ৭ মাস শিক্ষা লাভ

করেছেন সেখানে দরিদ্র খানার মহিলারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন ১ বছর ২ মাস। এছাড়া ভালো অবস্থার খানাগুলোর মহিলাদের তুলনায় দরিদ্র খানার মহিলাদের জীবিত সন্তান সংখ্যাও কম দেখা গেছে।

বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিহীনতা বাড়তে থাকে। দরিদ্রতর খানার ৬৭% মহিলা দীর্ঘস্থায়ী মারাত্মক শক্তিহীনতায় ভোগেন। ভালো অবস্থার খানার মহিলাদের তুলনায় দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে মধ্যম মানের দীর্ঘস্থায়ী শক্তিহীনতা ৪৭% বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, উভয় আর্থ-সামাজিক গ্রুপের যেসব মহিলা কখনোই লেখাপড়া করেননি তাদের পুষ্টিসূচক ১৮.৫ এর নীচে কিন্তু যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের পুষ্টিসূচক উভয় গ্রুপের বেশিরভাগ মহিলার ক্ষেত্রেই ১৮.৫- এর বেশি। আবার যেসব মহিলা তালাক অথবা বৈধব্যের কারণে একাধিকবার বিয়ে করেছেন তাদের ৫৮% এর পুষ্টিসূচক ১৮.৫ এর নীচে। পক্ষান্তরে যেসব মহিলার মাত্র একবার বিয়ে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ হার ৪৫%।

সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের পল্লী এলাকার মহিলাদের পুষ্টি অবস্থা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনমিতির মতো কতিপয় জটিল বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। মতলব এলাকায় প্রায় এক দশক আগে পরিচালিত একটি জরিপের তুলনায় বর্তমান জরিপে মহিলাদের পুষ্টি অবস্থার সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮৩ এবং ১৯৯২ সালে পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় মহিলাদের ওজন ৪০.১ কেজির তুলনায় ৪১.৯ কেজি, উচ্চতা ১৪৮.১ সেন্টিমিটারের তুলনায় ১৪৯.৩ সেন্টিমিটার এবং পুষ্টিসূচক ১৮.৩ এর তুলনায় ১৮.৮ এ উন্নীত হয়েছে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাপ্ত ফলাফল হলো বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে উভয় আর্থ-সামাজিক গ্রুপের মহিলাদের পুষ্টি অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনতি। দেখা যায়, ৩৫+ বয়সের মহিলাদের পুষ্টিসূচক ১৮.৫- এর নীচে হওয়ার সম্ভাবনা কম বয়সী মহিলাদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পরিচালিত কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা যায়, শৈশব থেকেই বৈষম্যমূলকভাবে ছেলেদের বেশি খাবার দেয়া হয়। দক্ষিণ ভারতের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মহিলারা তাদের স্বামীদের

আগে খাওয়ান, এরপর শিশুদের (এক্ষেত্রে মেয়েদের আগে ছেলেদের), এবং সর্বশেষে নিজেদের খাওয়ার কথা ভাবতে পারেন। এছাড়া খাদ্যের সবচেয়ে ভালো অংশ পুরুষদের পাতেই তুলে দেয়া হয়।
পাকিস্তানের এক জরিপেও পারিবারিক খাদ্য বন্টনে মহিলাদেরকে পুরুষদের অধঃস্তন হিসেবেই দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে যখন প্রশ্ন করা হয় কার সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন, তখন প্রায় সকল স্বামী এবং স্ত্রীদের অধিকাংশই উত্তর দেন স্বামীদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং এরপর শিশু ও বৃদ্ধদের। পাকিস্তানের পাঞ্জাবে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, জন্মের পর প্রথম দু'বছরে যখন মৃত্যুর আশংকা থাকে সবচেয়ে বেশি তখন বালিকাদের তুলনায় বালকদের চিকিৎসার জন্য প্রায় আড়াই গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়। মতলবে পরিচালিত এর আগের এক সমীক্ষায়ও অনুরূপ বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে অনেক বেশি নিয়ে যাওয়া হয়।

তৃতীয় যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় নারী শিক্ষা মহিলা ও তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রায় সুফল বয়ে আনে। নারীশিক্ষা মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মউপলব্ধি সৃষ্টি করে। ফলে স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সময়োচিত এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এ সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের দীর্ঘস্থায়ী শক্তিহীনতা একটি বহুমাত্রিক সমস্যা যার ব্যাপকতার কারণে এর উপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। দরিদ্র মহিলাদের প্রায় অর্ধেকের মাঝেই পুষ্টিহীনতা লক্ষ্য করা যায়। এ পুষ্টিহীনতা একটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের গর্ভাবস্থায় এবং পরবর্তীতে, যখন স্তন্যদানের জন্য প্রয়োজনীয় বর্ধিত পুষ্টিচাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। দীর্ঘস্থায়ী শক্তিহীনতা সমসাময়িক শক্তি স্বল্পতার সংগে একত্রিত হয়ে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের জন্য নেয়া স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিনীতি ও পুষ্টি সংক্রান্ত কর্মসূচি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। মেয়ে শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নে, ফলপ্রসু দারিদ্র্য বিমোচন এবং সমাজে মেয়েদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। যেখানে মহিলাদের অপুষ্টি একটি চিরস্থায়ী বিষয় সেখানে জাতির আগামী দিনের

নাগরিকদের স্বার্থেই তার মূল কারণ খুঁজে বের করে তা দূর করা প্রয়োজন। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মত বহুমুখী কার্যক্রম এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্র্যাকের পুষ্টি বিষয়ক কয়েকটি গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন*

এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

ভূমিকা

পুষ্টিহীনতা স্বাস্থ্য সমস্যার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতিবছর সারা পৃথিবী জুড়ে লাখ লাখ শিশু পুষ্টিহীনতার কারণে মারা যায়। বাংলাদেশে ৬ বছর বা তার চেয়ে কম বয়সের শিশুদের প্রায় ৭২% প্রয়োজনীয় দৈহিক ওজন ও দৈহিক বর্ধন থেকে বঞ্চিত। প্রায় ৩০ থেকে ৪০% নবজাতক শিশুরই দৈহিক ওজন প্রয়োজনীয় ওজনের অর্থাৎ ২.৫ কেজিরও কম। মায়েরাও পুষ্টিহীনতার শিকার। পুষ্টিহীনতা ছাড়াও ৭০% মা ও শিশু রক্তশুন্যতায় আক্রান্ত। ভিটামিন 'এ'-র অভাবে ১.৭% শিশু রাতকানা রোগের শিকার। আয়োডিনের অভাবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০.১% আক্রান্ত।

ভয়াবহ এ স্বাস্থ্য সমস্যার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত পুষ্টি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পুষ্টিহীনতা দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান তথা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আয়মূলক কাজে নিয়োজিতকরণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ, কর্মসংস্থান ও আয়ের সঙ্গে খাদ্য ক্রয় ক্ষমতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। খাদ্য থেকেই পুষ্টি আসে।

ব্র্যাক তার পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি মাধ্যমে বাংলাদেশের এ ভয়াবহ সমস্যা দূরীকরণ তথা পুষ্টিহীনতা জনিত শিশু মৃত্যু রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি এ লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এ ছাড়াও ব্র্যাক ১৯৮৭ সালে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান তথা আয়মূলক কাজে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সমন্বয়ে আইজিভিজিডি নামে একটি যৌথ কর্মসূচি হাতে নেয়। এ যৌথ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্য

* Summary of 4 RED research reports of 1994. 1. 'Food and nutrient intake of the rural poor: Findings from longitudinal database ' by K.Hoq: 2 Nutritional impact study of the income generation for vulnerable group development programme: report of July 1994 by SMZ Hyder; 3.Bangladesh: nurtitional situation and training needs by SMZ Hyder and GS Fakir, and 4. "IGVGD programme of BRAC: an alternative to approach to nutritional improvement by SMZ Hyder . (Summarized in Bangla by Maswoodur Rahman)

সহায্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা দিয়ে দরিদ্র মহিলাদের জীবন মান উন্নীত তথা তাদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলা যাতে তারা পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয়ে সক্ষম হয়।

লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন এসেছে কি না তা দেখার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৯৯৪ সালে বেশ কিছু গবেষণা চালায়। এ থেকে চারটি বাছাই করা গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ।

গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ

জুন ১৯৯৪-এ পরিচালিত এ গবেষণায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ এবং ঋতুভেদে এর পার্থক্য দেখা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য গ্রহণ এবং ভরা ও মন্দা মওসুমে খাদ্য গ্রহণে যে পার্থক্য দেখা দেয়, তার যাবতীয় তথ্য ব্র্যাকের গ্রাম সমীক্ষা প্রকল্পভূক্ত (Village study project) যাশোর ও জামালপুরের ১৩টি গ্রাম থেকে নেয়া হয়।

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত ও কর্মসূচি বহির্ভূত সদস্যদের মোট ক্যালরীর শতকরা ৮২ ভাগ এবং মোট প্রোটিনের ৬৫ ভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূতদের যথাক্রমে ৮৬ ও ৭২% যোগায়। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত সদস্যরা সুপারিশকৃত খাদ্যের ৯৬% গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে কর্মসূচি বহির্ভূত সদস্যরা গ্রহণ করে ৮৬ ভাগ।

খাদ্যগ্রহণ দুটি মওসুমে এক রকম নয়। তবে এ উভয় মওসুমে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূতদের চেয়ে কর্মসূচিভূক্তদের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো।

দেখা গেছে, খাদ্যের জন্য কর্মসূচি বহির্ভূতদের চেয়ে কর্মসূচিভূক্ত সদস্যরা তাদের আয়ের একটু বেশি অংশ ব্যয় করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্মসূচিভূক্ত সদস্যদের জীবন যাত্রার মান কর্মসূচি

বহির্ভূতদের চেয়ে সম্ভবতঃ ভালো। দেখা গেছে, মৌলিক খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য কর্মসূচি বহির্ভূতদের কেউই পর্যাপ্ত আয় করতে পারে না কিন্তু কর্মসূচিভূক্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে এ হার ৭৮%। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, কর্মসূচিভূক্ত সদস্যদের ২৩% এবং কর্মসূচি বহির্ভূতদের ৭০% চরম দারিদ্র্যের শিকার। আবার পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রেও কর্মসূচি বহির্ভূতদের অবস্থা কর্মসূচিভূক্তদের চেয়ে খারাপ।

খাদ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব

১৯৯৪ সালের এ গবেষণায় ব্র্যাকের আইজিভিজিডি কর্মসূচির ফলে পুষ্টির প্রভাব কতটা বৃদ্ধি পায় তা দেখা হয়। এ গবেষণার যাবতীয় তথ্য জুলাই মাসে সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় মোট ৭১৬টি শিশুর উপর স্বাস্থ্য বিষয়ক সমীক্ষা চালানোর সঙ্গে ৫৬৬টি খানা বা পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপরও সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় আইজিভিজিডি কর্মসূচিভূক্ত এবং কর্মসূচি বহির্ভূত খানা বা পরিবারের শিশু ছিল। দেখা যায়, আলোচ্য বছরের জানুয়ারি মাসের তুলনায় আইজিভিজিডি কর্মসূচিতে মহিলা প্রধান খানার সম্পৃক্ততা কম হলেও কর্মসূচি বহির্ভূত খানা বা পরিবারের আর্থ-সামাজিক ও শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থার চেয়ে কর্মসূচিভূক্ত খানার আর্থ-সামাজিক ও শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নততর।

আইজিভিজিডি কর্মসূচিভূক্ত খানার ৫২% খানাই হাঁস-মুরগী পালন করে। কর্মসূচিভূক্ত খানা হাঁস-মুরগী পালনের বাইরে গরু-ছাগল পালন, ছোট খাটো ব্যবসা ও তরকারীর বাগানের জন্য ৪২% ঋণ গ্রহণ করে। এ ঋণের ৫২% ব্যবহৃত হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ২২ ভাগ গরু-ছাগল পালনের কাজে।

আইজিভিজিডি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খুব কম সংখ্যক খানা টাকা পয়সার অভাবে গৃহের আসবাবপত্র বিক্রয় করে । বরং বেশি সংখ্যক খানাই গৃহের জন্য নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করে। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খানা বা পরিবারের অধিকাংশই কর্মসূচি বহির্ভূতদের চেয়ে বেশি হারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।

দেখা যায়, আইজিভিজিডি কর্মসূচিভূক্ত খানায় শিশু রোগ যেমন, ডাইরিয়া, সর্দিকাশি, রাতকানা রোগের ক্ষেত্রে এখনো তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে ভিটামিন এ ক্যাপসুলের ব্যবহার কর্মসূচি বহির্ভূতদের চেয়ে কর্মসূচিভূক্তদের মধ্যে তুলনামুলকভাবে বেশি। কর্মসূচিভূক্ত খানার শিশুরা কর্মসূচি বহির্ভূত খানার শিশুদের চেয়ে ৩৩% বেশি শিশু ডিম খেতে পায়। দেখা যায়, আইজিভিজিডি কর্মসূচিভূক্ত খানার শিশুদের ওজন ও দৈহিক বৃদ্ধি কর্মসূচি বহির্ভূত খানার শিশুদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি।

পুষ্টিমানের অবস্থা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

পুষ্টি সমস্যা এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের উপর ১৯৯৪-এর নভেম্বর মাসে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি ও সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করা। চতুর্থ পাচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৮৮% মানুষ যাতে খাদ্য পুষ্টি পায় এবং সে লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা। এ সম্পর্কিত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সুপারিশ ছিল শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের জন্য খাদ্য পুষ্টির ব্যবস্থাকরণ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমে বিশ্ব ব্যাংকও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টির অভাব দূরীকরণে ব্র্যাকসহ অন্যান্য অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পল্লী ঋণ দান ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণদান , বাগান, হাঁস-মুরগীর চাষ, পশু পালন, শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি অবলোকন, পুষ্টির বিকল্প সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মীদের পুষ্টির উপর প্রশিক্ষণ দান করছে।

পুষ্টি উন্নয়নে বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে আইজিভিজিডি কর্মসূচি

গবেষণায় ব্র্যাক কর্মসূচিভূক্ত খানার ৯.৩% মহিলাপ্রধান খানা এবং কর্মসূচি বহির্ভূত খানার মধ্যে ৩% মহিলাপ্রধান খানা ছিল। উভয় কর্মসূচিভূক্ত ও কর্মসূচি বহির্ভূত খানা সমান সংখ্যক ৯৬ মাস বা আরও কম বয়সের শিশু ছিল। কর্মসূচিভূক্ত খানার প্রায় ৯৩% কাঁচা ঘরে বাস করে। সে তুলনায় কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারের ৯১.১% বাস করে কাঁচা ঘরে। কর্মসূচিভূক্ত খানা বা পরিবারের ৬০% পরিবার প্রধানদের ও

কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারের ৬২.৫% এর কোন নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা নেই। দস্তখত করতে পারে এমন মায়েদের সংখ্যা কর্মসূচিভূক্ত এবং কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারে যথাক্রমে ২৮ এবং ৩৭.৫%। প্রায় ৮৩.৫ ভাগ কর্মসূচিভূক্ত পরিবারের এবং ৮১.৫ ভাগ কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারের বাসগৃহ ছাড়া কোন জমি নেই। প্রায় ৫২% কর্মসূচিভূক্ত খানা বা পরিবার হাঁস-মুরগী চাষ করে। সে তুলনায় কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারের হাঁস-মুরগী চাষ করেনা বললেই চলে। কর্মসূচিভূক্ত ও কর্মসূচি বহির্ভূত হাঁস-মুরগী চাষ করে এমন পরিবারের আয় যথাক্রমে টাকা ১৩৭.৯০ এবং টাকা ১৭.৮০।

গবেষণায় দেখা যায়, কর্মসূচিভূক্ত মায়েদের ৩৯.৯% মা মলত্যাগ করে তাদের হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে। সেখানে কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারের মাত্র ২৫.১% মা মলত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করে। কর্মসূচিভূক্ত প্রায় ৯৯ ভাগ পরিবার বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে। সে তুলনায় কর্মসূচি বহির্ভূত ৯৪% পরিবার বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে।

উপসংহারে বলা যায়, ব্র্যাকের আইজিভিজিডি কর্মসূচি পল্লীর দরিদ্র জনগণের আর্থ–সামাজিক, স্বাস্থ্য ও খাদ্য–পুষ্টির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ব্র্যাকের 'ওয়াচ' প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিবেদন*

আবদুলাহেল হাদী

'ওয়াচ প্রকল্প কী ও কেন?

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা না থাকায় সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উন্নয়নমূলক কোন সঠিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারছে না। এ বিষয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে ব্র্যাক ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে সাধিত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং যেসব পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের উপর প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে 'ওয়াচ' (Watch) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যোন্নয়ন তথা রোগ-ব্যাধি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্র্যাকের কর্মসূচিভূক্ত মানিকগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকা বেছে নেয়া হয়।

১৯৯৪ সালে ব্র্যাকের এ ওয়াচ প্রকল্প স্বাস্থ্য ছাড়াও শিক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ঋণ, শিশু শ্রম, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে।

বর্তমান প্রতিবেদনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, টিকাদান, ভিটামিন এ ক্যাপসুলের ব্যবহার, শিশুদের রোগ ও চিকিৎসা এবং ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকাদানের উপর ওয়াচ প্রকল্প আলাদাভাবে ১৯৯৪ সালে সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে, তা একত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

---

* ১৯৯৪ সালের ৬টি Watch Report-এর সার-সংক্ষেপ। বাংলায় সার-সংক্ষেপ করেছেন মসউদুর রহমান।

ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মকান্ড

অকাল মৃত্যু ও অসুখ-বিসুখ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা। তাই অকাল মৃত্যু ও অসুখ-বিসুখ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ব্র্যাক তার জন্মলগ্ন থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির কাজ করে আসছে। ব্র্যাক সে লক্ষ্যে কতোটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে, তা দেখার জন্য মানিকগঞ্জ জেলার ৩টি ইউনিয়ন এবং ১৯৮৭ সালে জয়পুরহাটের ৩টি ইউনিয়নে পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর ব্যাপক সমীক্ষা চালায়। এ গবেষণার জন্য উভয় এলাকায় প্রতি মাসে একবার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির ফলে অবশ্যই মৃত্যু ও অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্রাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা আরডিপি-র একটি উল্লেখযোগ্য দিক। গ্রাম সংগঠনের গ্রুপ সভায় স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া মহিলাদের মধ্যে গর্ভনিরোধক পিল ও কনডম বিক্রয় করা হয়। এর পরেও দেখা যায়, গবেষণা এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। এ ৭ বছরের মধ্যে এলাকায় (মানিকগঞ্জে) এ হার ১৬৭ ভাগ থেকে ১২৬ এ নেমে এসেছে, এবং ৬ বছরে উত্তরাঞ্চলে ১৩৪ থেকে ১২৪ এ নেমেছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার পুরুষের চেয়ে কম। তবে তুলনামূলকভাবে এ হার উত্তরাঞ্চলের মহিলাদের চেয়ে মধ্য অঞ্চলের মহিলাদের ক্ষেত্রে কম।

দেখা গেছে, শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ সালের পর মধ্য অঞ্চলে (মানিকগঞ্জ) কমের দিকে। শিশুদের টিকা দেয়ার হার মধ্য অঞ্চলে ধীরে ধীরে বেড়ে ১৯৯১ সালে সর্বোচ্চ ধাপে এসেছে। কিন্তু ১৯৯২ সালের পর থেকে এ হার কমের দিকে চলছে।

ভিটামিন এ ক্যাপসুল ব্যবহারের প্রবণতা ১৯৮৯ সাল থেকে বাড়ছে, মধ্য অঞ্চলে এর ব্যবহার ১৯৯১ সালে ছিল সর্বোচ্চ। পরে ১৯৯৩ সালে এর কমতি দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলে মধ্য অঞ্চলের চেয়ে এর ব্যবহার বেশি।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাস্থ্য সেবার মান বাড়ছে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা কমছে। ১৯৯২ সালে অর্ধেকেরই বেশি রোগী আধুনিক চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছে। সব এলাকায় বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমের ফলে ঝাড়-ফুক ও পানি পড়ার বদলে এখন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সমাদৃত হচ্ছে।

ব্র্যাক তার খাবার স্যালাইন, শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যক্ষ্মা চিকিৎসা প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বেশ সজাগ করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা যায়, প্রথম দিকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা যাচ্ছে না। সম্ভবত ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মকান্ডকে কমিয়ে দেয়ার জন্যই এটা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকার মূলতঃ ১৯৭৯ সালে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালে ইউনিসেফ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় সারা দেশ জুড়ে এ কর্মসূচি ব্যাপক আকারে গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ছিল এক বছর বয়সের শিশুদের শতকরা ৮৫ ভাগকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ধনুষ্টংকার, পলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, হাম ও যক্ষ্মার প্রতিষেধক টিকা দেয়া। ব্র্যাক ১৯৮৬ সালে ওয়াচ প্রকল্পের মাধ্যমে এ টিকাদান কার্যক্রম অবলোকনের জন্য মানিকগঞ্জ জেলার টিকাদান কর্মসূচিভুক্ত ৩টি ইউনিয়নের ৮৭টি গ্রাম হাতে নেয়, এর জনসংখ্যা ছিল ৫১,৭৩৯। ১৯৮৭ সালে জয়পুরহাট জেলারও ৩টি ইউনিয়ন হাতে নেয়। এ ৩টি ইউনিয়নের ৬৩টি গ্রামের জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৭০৮। ব্র্যাক ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি থেকে এ ২টি জেলার ৬টি ইউনিয়নে শিশুদের বছরে ২বার টিকাদানের উপর তথ্য সংগ্রহ করে।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত টিকাদান কার্যক্রম অবলোকন করা হয়। দেখা যায়, দেশের মধ্য অঞ্চলে বিসিজি টিকা দানের হার সর্বোচ্চ ৭৫.৬% এবং উত্তরাঞ্চলে এ হার মাত্র ৪৭.৫%। ঠিক একই সময় জাতীয় পর্যায়ে এ হার ছিল ৮৪%। দেখা গেছে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশুকে টিকার সব ডোজ দেয়া হয়নি। টিকা প্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে ছেলেদের হার কিছুটা বেশি।

টিকাদানের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের পার্থক্য উত্তরাঞ্চলে অনেক বেশি। মধ্য অঞ্চলে এ পার্থক্য তেমন উলেøখযোগ্য নয়। বিসিজি টিকার ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলেই এর উচ্চহার দেখা যায়, যদিও তা জাতীয় হার ৯৬% এর কম ছিল। বিসিজি টিকার তুলনায় হামের টিকা দানের হার কম।

শিশুদের টিকাদানের হার ১৯৮৯ সালে মধ্য অঞ্চলে ছিল ৪০%। তা বেড়ে ১৯৯১ সালে দাড়ায় ৮০%। দেশের উত্তরাঞ্চলে এ হার অধিক বৃদ্ধি পায়। টিকাদান কর্মসূচির প্রথম দিকে ১৯৮৯ সালে এ হার ছিল মাত্র ৩%। ১৯৯১ সালে সে হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯০% এ দাড়ায়।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি যদিও ১৯৯১ সালে ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এ হার ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুলের ব্যবহার

ভিটামিন ‘এ’-র অভাব চোখ বা দৃষ্টিশক্তির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। অন্ধত্ব ও রাতকানা রোগের কারণও ভিটামিন ‘এ’ র অভাব। বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ শিশু ভিটামিন এ র অভাবে ভুগছে এবং প্রতি বছর ৩০ হাজার অন্ধত্ব আক্রান্ত হয়। শিশুদের এ অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচি ১৯৭৩ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় কাজ শুরু করে। এ কর্মসূচি বছরে দুবার উচ্চমানের ভিটামিন এ ক্যাপসুল শিশুদের মধ্যে বিতরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষা কর্মসূচিও চালু করে।

দেখা যায়, ১৯৯৩ সালে প্রায ৭৫% শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। জয়পুরহাট এলাকায় ৮১.৩% এবং মানিকগঞ্জে ৭০.৪% ছেলেকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল দেয়া হয়। মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রেও এরূপ পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জ এলাকায় ক্যাপসুল বিতরণের হার ছিল ৭০%। তখন জাতীয়ভাবে সে হার ছিল মাত্র ৩৫%।

গ্রামাঞ্চলে শিশুদের রোগ এবং তার চিকিৎসা

সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় শিশুদের স্বাস্থ্যের মান বাড়ছে। ডায়রিয়া এবং ধনুষ্টংকার অনেকাংশে কমেছে। শিশুদের স্বাস্থ্যের মান বৃদ্ধি এবং রোগের প্রাদুর্ভাব কমার কারণগুলো স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৯৮৭ সালের তথ্যে দেখা যায়, ৫ বছর বা তার কম বয়সের শিশুরা সাধারণতঃ ডায়রিয়া, কৃমি, শ্বাসনালী ও ফুসফুসের প্রদাহ, চর্মরোগ ও কান পাকা রোগে আক্রান্ত হয়। বর্তমান প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্য হচ্ছে শিশুরা বর্তমানে এ রোগে আক্রান্ত এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ।

ব্র্যাকের ওয়াচ প্রকল্প এ লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকার ৩টি ইউনিয়নে এবং ১৯৮৭ সালে জয়পুরহাট জেলার ৩টি ইউনিয়নে এবং পরে ১৯৯৩ সালে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া দ্বীপে সমীক্ষা চালায়। এ ৩টি জেলার সমীক্ষভূক্ত এলাকার ৭২৩টি শিশুর উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিয়মিতভাবে ১৫ দিন পর পর এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্তমান প্রতিবেদনটির যাবতীয় তথ্য ১৯৯৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে সংগৃহীত হয়।

সমীক্ষার প্রথম ৬ মাসে সমীক্ষাভূক্ত ৯২.৫% শিশু কমপক্ষে এক ধরনের রোগে আক্রান্ত ছিল। প্রায় ২৯% শিশু কমপক্ষে ৪ ধরনের রোগে আক্রান্ত ছিল। উত্তরাঞ্চলের তুলনায় দক্ষিনাঞ্চলের শিশুরা বেশি রোগে আক্রান্ত হয়। মধ্য অঞ্চলে শিশুরা কম রোগে আক্রান্ত হয়।

বয়সের দিক থেকে দেখা যায়, ২ বছর বা তার কম বয়সের শিশুরাই রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। এ অবস্থা দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে একই রূপ। রোগাক্রান্তের ব্যাপারে মধ্য অঞ্চলে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু অন্য দুটি এলাকায় উত্তরাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়া বা শ্বাসনালী ও ফুসফুসের প্রদাহ বেশি দেখা যায়, যেখানে দক্ষিণাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া রোগের

প্রাদুর্ভাবই বেশি স্পষ্ট। দক্ষিণাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে চর্মরোগও বেশি। অন্য দুটি এলাকা যেমন মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে চর্মরোগের প্রবণতা কম।

প্রায় এক তৃতীয়াংশ রোগের চিকিৎসা করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক। এর মধ্যে এমবিবিএস, চিকিৎসা সহকারী বা গ্রাম্য চিকিৎসকও রয়েছেন। অন্যদিকে প্রায় ৪০% রোগের চিকিৎসা করেন প্রশিক্ষণবিহীন চিকিৎসকগণ। এর মধ্যে প্রশিক্ষণবিহীন গ্রাম্য চিকিৎসক, কম্পাউন্ডার ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রয়েছেন।

গর্ভকালীন সময়ে ধনুষ্টংকার এবং তার প্রতিষেধক টিকা

সন্তান প্রসবে সক্ষম সকল মহিলা, বিশেষ করে গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকা দান মা ও শিশুকে ধনুষ্টংকারের কবল থেকে মুক্ত রাখে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে ১৯৮৫ সাল থেকে সন্তান প্রসবে সক্ষম সকল মহিলাকে ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকা দিয়ে আসছে। এ টিকাদান কর্মসূচি মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ফলে ১৯৮৫ সালের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালে টিকা গ্রহণকারী মহিলাদের হার ৭৪%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি নাগাদ এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৮০% এ দাড়ায়। ১৯৯৩ সালে ভূমিষ্ট হওয়ার মোট ২,০৫৩টি শিশুকে অত্র সমীক্ষার জন্য তালিকাভূক্ত করা হয়।

দেখা গেছে, ১৯৯৩ সালে তালিকাভূক্ত ভুমিষ্ট হওয়া শিশুদের প্রায় ৭৭% মা-ই গর্ভকালীন সময়ে টিকা নিয়েছেন। মধ্য অঞ্চলে এ হার ৮৪.৯%। ১৯৯৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায়ও দেখা যায়, এ হার রাজশাহী বিভাগে (উত্তরাঞ্চলে) ছিল ৮৩% এবং ঢাকা বিভাগে (মধ্য অঞ্চলে) ১৮%। বয়সের ক্ষেত্রেও এ হারের বিভিন্নতা দেখা যায়। যুবতী মহিলারা বয়স্কা মহিলাদের চেয়ে বেশি ধনুষ্টংকারের প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করে। শিক্ষাও এ হারে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারে শিক্ষার ন্যায় আর্থিক স্বচ্ছলতাও এ টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করে। উত্তরাঞ্চলে টিকা গ্রহণকারী মহিলাদের হার মধ্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি। স্বচ্ছল পরিবারের মহিলারা ধনুষ্টংকারে খুব কম আক্রান্ত হয়।

স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক বিক্রয় ঃ সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা*

আহমেদ আলী, শাহনূর মাহমুদ, ফজলুল করিম, নজরুল ইসলাম ও কাওসার আফসানা

দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্র্যাকও পরিবার পরিকর্পনা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। এ সকল সংস্থা বিভিন্ন দাতা দেশের অনুদান নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে আসছিল। কিন্তু নিজেদের দেশে অর্থনৈতিক মন্দা এবং অন্যান্য নতুন নতুন দেশে সাহায্য কর্মসূচি সম্প্রসারণের কারণে দাতা দেশগুলো এখন বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে অনুদান অনেক কমিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিগুলো বিনামূল্যে বিতরণের কারণে এ কর্মসূচি অনেক ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সোস্যাল মার্কেটিং কোম্পানী এবং অন্যান্য এনজিওরাও তাদের কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রি করছে।

ব্র্যাক তার পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমের মাধ্যমে গত ৮ বছর থেকে মহিলা কর্মসূচি সংগঠক (পিও), কর্মসূচি সহকারি (পিএ) এবং স্বাস্থ্য সেবিকার মাধ্যমে গর্ভধারণযোগ্য মহিলাদের মধ্যে সচেনতা বৃদ্ধি করে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ কর্মসূচি কিছুটা ব্যয় নির্বাহ এবং স্থায়ীত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্র্যাকও সম্প্রতি তার স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রয় শুরু করেছে। এজন্য ব্র্যাক জেলাভিত্তিক এসএমসি ডিপো থেকে স্বল্পমূল্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলো ক্রয় করে সেবিকাদের মাধ্যমে গ্রামে বিক্রি করছে।

এ বিক্রির ফলে সেবিকাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়েছে। এ গবেষণার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম আছে আরডিপি'র এমন ২৭টি এলাকা থেকে ৫টি এলাকা বাছাই করা

---

* Summary of RED research report entitled 'Contraceptive sale through shasthya shebikas in RDP-PHC area: problems and prospects by Ahmed Ali, et. al. 1994 July. 26p. (Summarized in Bangla by Shenjuti Ara)

হয়। এলাকাগুলো হচ্ছে: নাভারন, ঝিকরগাছা, বাকরা, কাজির হাট ও নান্দিনা। এ ৫টি এলাকায় ১৯৮৬ বা তার পূর্বে থেকেই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম চলে আসছে। তুলনামুলক বিচারের জন্য এ সকল বাছাইকৃত গবেষণা এলাকা সংলগ্ন এবং ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের পরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম শুরু হয়েছে এমন ৫টি আরডিপি এলাকা নেয়া হয়। এলাকাগুলো হচ্ছে চৌগাছা, যশোর সদর, চুরামনকাঠি, মনিরামপুর এবং সরিষাবাড়ি। ৫টি বাছাইকৃত এলাকা থেকে মোট ৩০টি গ্রাম এ গবেষণার জন্য নেয়া হয়। প্রত্যেকটি গ্রামের ১০টি সক্ষম দম্পতিকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে ৩০০ খানা বা পরিবারে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ঠিক একইভাবে কম্পারিজন (তুলনাকৃত) এলাকা থেকেও ৩০০ খানা বা পরিবারের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

ফলাফল

আরডিপি'র গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দম্পতিদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার কর্মসূচি এলাকায় কম্পারিজন এলাকার দম্পতিদের চেয়ে বেশি, যথাক্রমে ৫০% এবং ৪৮%। উভয় এলাকায় গ্রাম সংগঠনভূক্ত দম্পতিদের মধ্যে অস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহারের হার একই রকম (৩৭%)।

গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দম্পতিদের মধ্যে স্থায়ী গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার কিছুটা বেশি। কর্মসূচি এলাকায় (১৩%) কম্পারিজন এলাকায় ১২%। উভয় এলাকাতেই সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার অনেক বেশি।

সাধারণভাবে উভয় এলাকায় প্রায় ২০% দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ক্রয় করে। গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দম্পতিদের মধ্যে কর্মসূচি এলাকায় এর হার ১৫% এবং কম্পারিজন এলাকায় ১৪%।

তথ্য সংগ্রহের সময় ২৭ জন স্বাস্থ্য সেবিকার মধ্যে ২৪ জনকে গর্ভনিরোধক বিক্রয়ে নিয়ুক্ত থাকতে দেখা গেছে। এই ২৪ জন সেবিকার মধ্যে ৭৮% বাকিতে বিক্রি করেন এবং মাত্র ১৭% নগদে বিক্রি করেন। বাকী ৫% বিনা পয়সায় বিতরণ করলেও দেখানো হয়েছে যে বিক্রি করেছে।

মহিলা পিও ও পিএ ৪০% এবং ৮৭% স্বাস্থ্যসেবিকা জানান যে, সরকারি কর্মচারীদের বিনামূল্যে গর্ভনিরোধক বিতরণ তাদের বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এক পঞ্চমাংশ পিও এবং সেবিকা তাদের বিক্রিকৃত পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে দায়ী মনে করেন। তবে অধিকাংশ পিএ বাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে এটাকে কোন সমস্যা বলে মনে করে না।

স্বাস্থ্যসেবিকাদের ৫২% জানান, গ্রামবাসীদের ধারণা সেবিকারা ব্র্যাক থেকে বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী নিয়ে তাদের কাছে বিক্রয় করে। অন্যদিকে প্রায় ৩৯% গ্রামবাসীরা তাদের বিক্রিকৃত সামগ্রীর মান উন্নততর বলে মনে করে। অধিকাংশ সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মী মনে করেন, ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকাগণের এ বিক্রি মূলত তাদেরই কাজকে সহজ করে তোলে। এর ফলে মহিলাদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। আবার মাত্র ১৩% সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মী মন্তব্য করেন যে, ব্র্যাকের সেবিকাদের এসকল সামগ্রী বিক্রয় তাদের কাজকে বিঘ্নিত করছে।

স্বাস্থ্যসেবিকাদের মতে, ৭৮% পরিবার কল্যাণ সরকারী, ৩০% পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক এবং ৯% পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক তাদের (সেবিকাদের) জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। মাত্র ৮% পরিবার কল্যান সহকারী এ বিষয়ে সন্তুষ্ট নয়। তবে অধিকাংশ ব্র্যাক কর্মী এবং স্বাস্থ্য সেবিকা জানান জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিক্রির জন্য পরিবার কল্যান সহকারী ও স্বাস্থ্য সেবিকাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি বা কোনরূপ বিরোধও দেখা দেয়নি। তবে স্বাস্থ্যসেবিকারা জানান যে, ৯১% পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ৭০% পরিবার কল্যান নিরীক্ষক এবং ১৩% পরিবার কল্যান সহকারীকে তারা চেনেনা বা যোগাযোগ নেই।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক বিক্রির সম্ভাবনা উজ্জল। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে হবে। এছাড়া সরকারি পরিবার কল্যাণ সহকারী ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে ফাঁক আছে তাও দূর করতে হবে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়ন এবং এ সকল পদ্ধতি বিক্রয়কে বাধামুক্ত করার জন্য ব্র্যাকের মহিলা পিও ও পিএদের অধিক মাত্রায় সক্রিয় হতে হবে। গ্রাম সংগঠনের সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে গ্রামের সক্ষম দম্পতিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহার এবং বিক্রি বাড়াতে হবে।

ব্র্যাক কর্মীদের সক্ষম দম্পতিদের সাথে যোগযোগ ছাড়াও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, নেতা এবং ধর্মীয় নেতা প্রভৃতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার এবং বিক্রির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বিভিন্ন সমাবেশ করতে হবে। তাছাড়া স্বাস্থ্যসেবিকা ও সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

যৌনব্যাধি সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা ঃ দু'টি এলাকার চিত্র*

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, কাওসার আফসানা, হাসিমা-ই-নাসরিন ও এ এম আর চৌধুরী

যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সংক্রমিত ব্যাধিকে সাধারণত যৌনব্যাধি হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ ব্যাধি মানব জীবনে নিয়ে আসে ভয়াবহ পরিণতি। এতে মানুষ দৈহিকভাবে যেমন পঙ্গু হয়ে যায়, তেমনই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পরে দাম্পত্যক্ষেত্রে এবং সামাজিকভাবে। শারীরিকভাবে যৌনব্যাধি মানুষকে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অক্ষম করে তোলে, প্রাণহানির কারণও ঘটায়। আর সামাজিকভাবে মানুষকে এই ব্যাধির ফলে ভুগতে হয় পরিত্যাক্ত জীবন, মহিলাদের হতে হয় তালাক ও নৃশংসতার শিকার।

যৌনব্যাধি সম্পর্কে বিশদ তথ্য উন্নত দেশগুলো থেকে পাওয়া গেলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রকৃত পরিস্থিতি নানা কারণে সকলের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। এর প্রধান কারণ হলো সামাজিক জীবনে গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতা। বাংলাদেশে এই প্রবণতা বলতে গেলে সহজাত। ফলে যৌনব্যাধি ঘটিত পরিস্থিতি সম্পর্কে সীমিত আকারে কয়েকটি জরিপ ও সমীক্ষা চালানো হলেও তা প্রকৃত চিত্র পুরোপুরিভাবে তুলে ধরতে পারেনি। এই প্রেক্ষিতে ব্র্যাক বাংলাদেশের যৌনব্যাধির প্রকোপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা পরিচালনা করে। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ মোট তিনটি পর্যায়ে এই সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমান সমীক্ষাটি প্রথম পর্যায়ের।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সামাজিক স্তরে যৌনব্যাধি সংক্রান্ত প্রকৃত পরিস্থিতি এখনও আমাদের দেশে অজানা রয়ে গেছে। আরও গুরুতর বিষয় হলো যৌনব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সাধারণ বিবরণ, তাদের যৌন আচরণ, স্থানীয়ভাবে রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসাগত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। দেশের দু'টি অঞ্চলে পরিচালিত এ সমীক্ষায় যৌনব্যাধি সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় চিকিৎসা প্রদানকারী ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন ছিল বর্তমান গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য।

---

* Summary of the RED research report entitled 'An exploratory study on sexually transmitted diseases in two regions of Bangladesh' by Md. Nazrul Islam, et.al. 1994 August. 24p. (Summarized in Bangla by Sazzad Qadir)

গবেষণার ফলাফল

যোগ্যতাসম্পন্ন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকরা (যারা সাধারণত হাসপাতালে ও প্রাইভেট ক্লিনিকে কর্মরত রয়েছেন) সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ ও উৎসর্গের উপর ভিত্তি করে যৌনব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। পুরুষ রোগীরা সাধারণতঃ গণোরিয়া, সিফিলিস, গণোকক্কাল বিহীন মুত্রপ প্রদাহ প্রভৃতিতে আক্রান্ত হন। মহিলারা ট্রাইকোমোনিয়াসিস ও জিয়ারডিয়াসিস ব্যাধির শিকার হন। যে সব চিকিৎসকের যথাযথ ডিগ্রী নেই এবং গ্রামাঞ্চলে যারা হাতুড়ে বলে পরিচিত তাদের সূত্রে জানা গেছে, যৌনরোগীরা সাধারণতঃ গণোরিয়া, সিফিলিস, বিকৃত পুরুষাঙ্গ, নিস্তেজ পুরুষাঙ্গ, নিরুত্তাপ সঙ্গম, পাতরা ধাতু, স্বাপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া, অনিয়মিত স্রাব প্রভৃতিতে ভুগে থাকেন। এসব রোগের ক্ষেত্রে হাতুড়ে ডাক্তার এ্যান্টিবায়োটিকস, অ্যানলজেসিকস, এ্যানটিহিসটামিন ও মলম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কবিরাজ ও হেকিমরা বিভিন্ন ধরনের ভেষজ বড়ি, মিকচার, হালুয়া, মালিশের তেল, লতা-পাতা ইত্যাদি প্রয়োগ করে থাকেন।

সুপারিশ

যৌনরোগ নির্ণয়, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, সংক্রমণ বন্ধ করার পদ্ধতি এবং প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে যেমনঃ

১. যোগ্যতাসম্পন্ন (ডিগ্রী প্রাপ্ত) সকল চিকিৎসক যৌনরোগীদের সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দায়িত্ব নেবেন। তাদের বোঝাতে হবে কিভাবে যৌন রোগ ছড়ায় এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী। ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সংসর্গ কিভাবে এড়িয়ে চলতে হয় তাও তাদের বোঝাতে হবে।
২. যৌন রোগীরা যাতে নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত চিকিৎসার মেয়াদ পুরো করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. যথাযথ চিকিৎসা ও সংক্রমণ নিরোধের উদ্দেশ্যে যৌন রোগীদের পাশাপাশি তাদের যৌন সঙ্গীদেরও চিকিৎসা করতে হবে।

৪. সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সকল চিকিৎসককে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত "সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ" অনুযায়ী যৌন রোগীদের চিকিৎসা করতে হয়।

৫. পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে যৌন রোগের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।

উপসংহার

অনেক অযোগ্য ও হাতুড়ে চিকিৎসক অনেক যৌন রোগীদের চিকিৎসা করেছেন। দেখা গেছে, তারা কেউই চিকিৎসার কোর্স পূর্ণ করেননি। আবার দেখা গেছে, যারা ভাল কিংবা যোগ্য ডাক্তার তারা যৌন সংগীর চিকিৎসা না করিয়ে শুধুমাত্র রোগীর চিকিৎসা করেছেন। ফলে দেখা গেছে, এতে কেউই লাভবান হয়নি। কারণ এ রোগ একজন হতে অন্যজনে সংক্রমিত হয়। এ রোগ নিরাময়ের জন্য একসাথে দুইজনারই চিকিৎসা করাতে হবে।

কবিরাজ, হেকিম অথবা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারগণ স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন, বীর্য পাতলা ও প্রস্রাবের আগে বা পরে ধাতু নির্গত হওয়াকে এক ধরনের যৌন রোগ বলে মনে করে। এজন্য তাদের চিকিৎসা করায়। এতে রোগীরা কেবলই প্রতারিত হয় ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়। এজন্য জনগণকে বোঝাতে হবে ও সচেতন করে তুলতে হবে যে, এগুলো স্বাভাবিক বিষয়। আবার কিছু যৌন রোগকে তারা যৌন রোগ বলে মনেই করেনা। অথচ এর চিকিৎসা করাতে দেরি হলে মারাত্মক জটিলতা দেখা দেয়। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার যৌন রোগীদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। তাদেরকে সমাজে অন্যান্য রোগীদের মত বিবেচনা করে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক একটি মূল্যায়ন*

ফজলুল করিম, এ এম আর চৌধুরী, শাহ্ নূর মাহমুদ, নজরুল ইসলাম ও আহমেদ আলী

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরডিপি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বা প্রাইমারী হেলথ কেয়ার (পিএইচসি) প্রায় ১৬ লক্ষ জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পুষ্টি শিক্ষা এবং ধাত্রী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১৯৯৪ সালে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের পাঁচ সদস্যের একটি দল ব্র্যাকের আরডিপি-পিএইচসি কর্মসূচির উপর একটি সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

- ব্র্যাক সদস্য পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা দেখা;
- গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যসেবিকা ও ধাত্রীদের কর্মকান্ড দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে টেকসই কিনা তা পরীক্ষা করা; এবং
- ঔষধ, জন্ম বিরতিকরণ বড়ি ও কনডম এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহের বিনিময়ে মূল্য আদায় ব্যবস্থা (সার্ভিস চার্জ) চালুকরণ বিষয়ে পরীক্ষা করা।

গবেষক দল দুটি পুরাতন কর্মসূচি এলাকা এবং দুটি নতুন কর্মসূচি এলাকা পরিদর্শন করেন। পুরনো এলাকার মধ্যে সাতক্ষীরার কলারোয়া ও মানিকগঞ্জের কৃষ্ণপুর এবং নতুন এলাকার মধ্যে শেরপুর জেলায় শ্রীবর্দি ও বক্সিগঞ্জ এলাকা।

তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশিষ্ট কর্মসূচির নির্বাহী কর্মকর্তা, মাঠ কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী ও গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং কর্মসূচির বিভিন্ন প্রতিবেদন, রেকর্ডপত্র ইত্যাদি সহ বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট রিভিউ করা হয়।

---

* Summary of the RED research report entitled "The primary health care component under the rural development programme of BRAC: a review" by Fazlul Karim, et.al. 1995 March. 63p. (Summarized by AKM Ahsan Ullah)

ফলাফল

কর্মসূচির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার উপর বিভিন্ন সেবা গ্রহণের হার লক্ষনীয়ভাবে বেড়েছে। যেমন, চারটি এলাকায় জন্ম বিরতিকরণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ৫৪% , শিশুদের টিকাদানের হার ৮১%, সাধারণ মহিলা ও গর্ভবতী মহিলাদের টিটি টিকা গ্রহণের হার ৭৪%। দেখা গেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের দ্বারা ৯৩% ডেলিভারী সম্পন্ন হয়েছে। শতকরা ১০.৮টি খানায় স্ল্যাব ল্যাট্রিন ও শতকরা ২৪.৭টি খানায় নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পুরাতন এলাকায় একজন গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী প্রতি মাসে গড়ে ২৬টি রোগীর চিকিৎসা করেছে কিন্তু নতুন এলাকায় এর সংখ্যা ছিলো ২৩। জন্ম বিরতিকরণ সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন এলাকার অবস্থা পুরাতন এলাকার চেয়ে ভাল (নতুন এলাকা ৫৬.৮% ও পুরাতন এলাকা ৫০%।) নলকূপ স্থাপনও নতুন এলাকায় বেশি হয়েছে। সার্বিক বিচারে দেখা গেছে, ব্র্যাক সদস্যরাই বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করতে পেরেছে।

দেখা গেছে, ২৭টি পুরাতন এলাকার ১,৩৫৭ জন ধাত্রীকে নিরাপদ প্রসব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু এ প্রশিক্ষণ নানা কারণে নতুন এলাকায় বন্ধ রাখা হয়। এর বিকল্প হিসেবে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা এসব এলাকার গর্ভবতী মায়েদেরকে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

আবার দেখা গেছে, প্রতিটি এলাকার ২-৩ জন ব্র্যাক সদস্যকে স্ল্যাব ল্যাট্রিন তৈরির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বর্তমানে তাদের ২/১ জন আরডিপি-পিএইচসির তত্ত্বাবধানে স্ল্যাব ল্যাট্রিন তৈরিতে নিয়োজিত আছে।

আরডিপি-পিএইচসি সেবার বিনিময়ে মূল্য আদায়ের (সার্ভিস চার্জ) একটি পদ্ধতি চালু করেছে। সোস্যাল মার্কেটিং কোম্পানী থেকে খাবার বড়ি ও কনডম, বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী থেকে কিছু ঔষধ, বিএডিসি থেকে কিছু শাক-সবজির বীজ এবং স্থানীয় পাইকারী বিক্রেতাদের কাছ থেকে নলকূপ নিয়ে গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। আরডিপি-পিএইচসি ঔষধ থেকে ২%, জন্ম বিরতিকরণ বড়ি ও

কনডম থেকে ৭%, ও শাক-সবজির বীজ থেকে ১১% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করেছে। সামগ্রীক হিসেবে দেখা গেছে যে, আরডিপি-পিএইচসি সর্বমোট খরচের উপর প্রায় ১.৭% সার্ভিস চার্জ আদায় করতে সফল হয়েছে।

আরডিপি-পিএইচসি স্যাণ্ডিটারি ল্যাট্রিন ও নলকূপের জন্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোন সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে না। গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্রেতাদের কাছ থেকে ল্যাট্রিন কিংবা নলকূপ প্রতি ১০ থেকে ১০০ টাকা পান।

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সার্ভিসের ১৯৯৩ সালে নতুন গ্রহীতার গড় হার নিম্নরূপ :

> পুরাতন এলাকার ৯৭৭ জন ও নতুন এলাকায় ১৬৫১ জন দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, পুরোপুরি মাত্রায় টিকা দেয়া হয়েছে নতুন এলাকায় ১,২৬৪ জন শিশু ও মহিলাকে অপরদিকে , পুরাতন এলাকার ১,৩০৭ জন শিশু ও মহিলাকে। নতুন এলাকায় পুরাতন এলাকার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে। পুরাতন এলাকায় ৭১৪টি খানায় এবং নতুন এলাকার ১,২১৩ টি খানায় ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।
>
> নতুন এলাকার চেয়ে পুরাতন এলাকার বহুগুণ বেশি গ্রাম সংগঠন সদস্যকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয় (নতুন এলাকায় ১,৭১৭, পুরাতন এলাকায় ১০,২০৩ জন)। স্বাস্থ্যকর্মীদের মাসিক গড় আয় দাড়ায়: পুরাতন এলাকায় ৯৭ টাকা এবং নতুন এলাকায় ৪৬ টাকা।

সুপারিশমালা

আরডিপি-পিএইচসি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দৃশ্যত: সফল হয়েছে। তবে এর আরো উন্নয়নকল্পে সমীক্ষা দল কতিপয় সুপারিশ প্রদান করেছেন। যেমন:

- আরডিপি-পিএইচসি বিভিন্ন খানা পরিদর্শন করে গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মী, ধাত্রী, এনএফপিই শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে খাবার স্যালাইন এর উপর পুনরায় প্রশিক্ষণ দিতে পারে।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে গ্রাম সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ভূমিকা স্পষ্ট হওয়া উচিত।
- পুরুষদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের জন্য গ্রাম সংগঠনের পুরুষ সদস্য ও অন্যান্য পুরুষ নিয়ে একটি স্বাস্থ্য ফোরাম গঠন আবশ্যক।
- আরডিপি-পিএইচসি তে কর্মী সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ মাত্র একজন ডাক্তার ১১৭টি এলাকার দায়িত্ব পালন করেন যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়।
- আরডিপি-পিএইচসি র একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (MIS) থাকা আবশ্যক।
- গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীদের সার্ভিস চার্জ বাড়িয়ে দেয়া উচিত। তবে তা চালু করার পূর্বে বাজার যাচাই করা প্রয়োজন।
- গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্ম বিরতিকরণের বহুমুখী বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি বিক্রি করতে দেয়া যেতে পারে, এতে দম্পতিদের সুবিধামত একটি পদ্ধতি বেছে নিতে বা সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।
- ব্র্যাক আরডিপি-পি.এইচ.এস এর মাধ্যমে হেলথ ইন্সুরেন্স স্কীম চালু করতে পারে। এতে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে গ্রাম সংগঠনের সদস্য ও সদস্য পরিবার আত্মনির্ভর হতে পারবে।
- যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে আরডিপি-পিএইচসি সকল এলাকায় তাদের এ কর্মসূচি চালু করতে পারে।

উপসংহার

সামগ্রীকভাবে দেখা যায় যে, আরডিপি-পিএইচসি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী কার্যক্রম এবং সার্ভিস চার্জ আদায় বিষয়ক উদ্যোগ এক বিশেষত্ব বহন করে এবং এটা অন্যান্য কর্মসূচির জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। তবে দেখা গেছে, ১১৭টি এলাকার জন্য মাত্র একজন ডাক্তার রয়েছে, এতে

ডাক্তারদের উপর কাজের অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এছাড়াও সকল ধাত্রী ও গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজ কর্ম তদারকীর ভার ডাক্তারের উপর। ফলে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক।

খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি ও এর ব্যবহারবিধি গ্রামীণ মায়েরা কতদিন মনে রাখতে পারেন?*

আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, ফজলুল করিম, এসকে সরকার, আর এ ক্যাশ ও আব্বাস ভূঁইয়া

আশির দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডায়রিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে খাবার স্যালাইনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন বাঁচাতে খাবার স্যালাইনের ভূমিকা অপরিসীম। এর পরেও সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ লোক এ রোগে মারা যায়। ডায়রিয়ার শিকার অধিকাংশই শিশু। এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ব্র্যাক বাংলাদেশে ১০ বছরে (১৯৮০-১৯৯০) মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ মাকে ঘরে বসে খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছে। সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী জনগণকে খাবার স্যালাইন ব্যবহারে উৎসাহিত করছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারও পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী স্যালাইন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শুরু করেছে।

ব্র্যাকের এ কর্মসূচিভুক্ত মায়েদেরকে স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি একবারই শেখানো হয়েছিল। দেখা গেছে শেখানোর এক মাসের মধ্যে ৯০% মা নিরাপদ ও কার্যকরী স্যালাইন তৈরি করতে পারে। কিন্তু দু এক বছর পরে এ হার হ্রাস পেতে থাকে। ব্র্যাক বাংলাদেশে খাবার স্যালাইন ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান শুরু করেছে আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে। তখন থেকে এ কর্মসূচিভুক্ত গ্রামগুলোতে বিভিন্ন সময়ে স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি, এর ব্যবহার এবং প্রাপ্যতার উপর সমীক্ষা চালনো হয়।

---

* Summary of the RED Research report entitled "Status of oral rehydration therapy in Bangladesh: how widely is it used?" by AMR chowdhury, et.al. 1994 September. 34p. This report is being published in *Health policy & Planning* (March 1997). (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

বাংলাদেশে খাবার স্যালাইনের প্রচলন

ষাটের দশকের শেষের দিকে খাবার স্যালাইন আবিষ্কারে আইসিডিডিআর,বি-র অগ্রণী ভূমিকা বাংলাদেশকে ইতিহাসে একক স্থান করে দিয়েছে। ব্র্যাক ১৯৭৯ সাল থেকে পানি, লবন ও গুড় দিয়ে স্যালাইন প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিতে শুরু করে। ১৯৮০-৮৩ সালে প্রথম পর্যায়ে ২৫ লাখ, দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৮৩-৮৬) ৫০ লাখ এবং ১৯৮৬-৯০ সালে তৃতীয় পর্যায়ে ৫০ লাখ মা'কে খাবার স্যালাইন তৈরি প্রণালী শেখানো হয়েছে। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে মায়েদেরকে এ পদ্ধতি শিখিয়েছে। স্কুলে, মাদ্রাসা, মস্‌জিদ কিংবা বাজারে বিভিন্ন রকম সভা, সমিতি ও সেমিনারের মাধ্যমে পুরুষদেরকেও এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে।

দেশে ডায়রিয়া কর্মসূচিতে ব্র্যাকের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৯৪ সালে আইসিডিডিআর,বি খাবার স্যালাইন আবিস্কারের ২৫ বছর পূর্তিতে ব্র্যাককে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করে ORS Award প্রদান করে।

জাতীয় খাবার স্যালাইন কর্মসূচি (National Oral Rehydration Programme) **বা NORP** ১৯৭৯ সালে তাদের কর্মকান্ড শুরু করলেও বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব হয়নি। ১৯৮৯ সালের দিকে সরকার একটি নতুন ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি হাতে নেয়। একই সময়ে খাবার স্যালাইন ব্যবহার সর্বজনীন করার লক্ষ্যে সরকার ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফজলে হাসান আবেদকে প্রধান করে একটি নীতি নির্ধারণী কমিটি গঠন করে।

আমেরিকান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সোস্যাল মার্কেটিং কোম্পানী তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের স্যালাইন জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রচার অভিযান চালায়। ১৯৮৩ সালে তাদের তৈরি ৪২,৮৮০ প্যাকেট স্যালাইন বিক্রি হয়েছে এবং ১৯৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ প্যাকেটে দাড়ায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

বাংলাদেশে ব্র্যাক ১ কোটি ২০ লক্ষ মা কে লবন-গুড়ের খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি শিখিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে অনেক মাই এ পদ্ধতি ভুলে গেছেন। মায়েদের তৈরি স্যালাইন কতটুকু নিরাপদ ও কার্যকরী এবং গ্রামে তা ব্যবহারের হার কিরূপ তা পরীক্ষা করে দেখাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। এছাড়াও, গ্রামে প্যাকেট স্যালাইনের প্রাপ্যতা এবং এর প্রতি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের মনোভাব কেমন তা পরীক্ষা করাও ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

তথ্য সংগ্রহের জন্য এপ্রিল-মে মাসে বেছে নেয়া হয়। এ মাসেই সাধারণত গ্রামে ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। গবেষণার জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে কর্মসূচিভূক্ত প্রতিটি এলাকা থেকে ৩০টি করে গ্রাম বেছে নেয়া হয়। প্রতিটি গ্রামে থেকে ১০০ জন মহিলাকে সাক্ষাৎকারের জন্য বাছাই করা হয়। ৩টি এলাকার ৯০টি গ্রামের মোট ৯,০০০ মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এদের শতকরা ৩ জনকে লবন ও গুড়ের স্যালাইন ও প্যাকেটের স্যালাইন প্রস্তুত করতে বলা হয়। এ উভয় প্রকার তৈরি স্যালাইন পরীক্ষার জন্য আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণাগারে পাঠানো হয়। সোডিয়াম টেষ্ট অধিকতর ব্যয়বহুল বিধায় উভয় প্রকার মোট ২৬৯টি স্যালাইনের ক্লোরাইড টেষ্ট করা হয়।

ফলাফল

গবেষণায় দেখা গেছে, স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি শেখানোর ১২ বছর পরেও উলেøখযোগ্য সংখ্যক মায়েরা নিরাপদ ও কার্যকরী স্যালাইন প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু সময় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই হার হ্রাস পেতে থাকে। এই পদ্ধতি ভুলে যাওয়ার কারণ হিসাবে সুদীর্ঘ সময়কেই চিহ্নিত করা হয়। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে, শিক্ষিত মায়েদের তৈরি স্যালাইন গুণগত মানের দিক দেয়ে অধিকতর ভাল।

গ্রামের সাধারণ লোকেরা ডায়রিয়াকে চারভাগে চিহ্নিত করে এবং প্রত্যেকটি আলাদা নামে পরিচিত। মূলত: বুকের দুধপান জনিত কারণে শিশুদের যে ডায়রিয়া হয় গ্রাম্য জনগণ তাকে ‘দুধহাগা’ বলে জানে।

বদ হজমের জন্য যে ডায়রিয়া হয় সেটা হল ‘অজির্ণ’। এটা যে কোন বয়সের লোকের হতে পারে। আবার যদি শুধু রক্ত কিংবা শেশ্মা নির্গত হয় তখন তাকে ‘আমাশয়’ বলা হয়। এটাও যে কোন বয়সের লোকের হতে পারে। আর প্রচন্ড তরল পায়খানা হলে তাকে ‘কলেরা’, ডায়রিয়া বা দাস্ত বলে। কলেরাও যে কোন বয়সের হতে পারে। এক্ষেত্রে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যায়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, দুধহাগা ধরনের ডায়রিয়া শিশুদের সচরাচর আক্রমণ করে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরাই ডায়রিয়ার শিকার হয় বেশি। আর নারীদের তুলনায় পুরুষরাই এই রোগে বেশি ভোগে। দেখা গেছে, কলেরা রোগীদের ৬০% এর বমি হয় এবং আমাশয় রোগীদের মধ্যে এর প্রবণতা কম।

কর্মসূচিভুক্ত এলাকাগুলোতে ৭৫% ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করেছে। এই হার কলেরার রোগীদের মধ্যেই বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কলেরা রোগীদের খাবার স্যালাইন দেয়া হলেও লবন-গুড় মিশ্রিত স্যালাইনের ব্যবহার কম। তবে ব্র্যাকের কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় এর ব্যবহার অধিকতর বেশি। খাবার স্যালাইন সেবনের হার শতকরা ৬০ ভাগ, তবে কলেরা বা ডায়রিয়াতে তা বেড়ে গিয়ে ৮০% এ উঠে। খাবার স্যালাইন ব্যবহার করেনা এমন অনেকেই বলেছে যে, তারা এর কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতো না বা অনেকেই পাতলা পায়খানাকে ভয়াবহ রোগ মনে করে না। তাদের একটি অংশ জানিয়েছে সংগতি নেই বলে প্যাকেট স্যালাইন ব্যবহার করে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, পাতলা পায়খানা চলাকালে ৯৫% তাদের শিশুকে স্বাভাবিক খাবার দিয়ে থাকে। আরো দেখা গেছে, ৬ মাস বয়সী রোগীদের জন্য সমীক্ষাধীন এলাকায় ৭৬ জন ঔষধ বিক্রেতাদের মধ্যে ১৪ জন খাবার স্যালাইন ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে, ১০ জন এলোপ্যাথিক ঔষধ এবং অধিকাংশই উভয় পদ্ধতির কথা বলেছে। এদের মধ্যে ৬৪ জন খাবার স্যালাইনের সাথে অন্যান্য কিছু সেবনের পরামর্শ দিয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রাম্য ডাক্তারদের অর্ধেকই ডায়রিয়ার জন্য এন্টিবায়োটিক, প্যাকেট স্যালাইন ও ইনজেক্শনের পরামর্শ দিয়ে থাকে। লবন-গুড়ের স্যালাইনের কথা বলেছে মাত্র ৩% জন। গ্রামের ৮০%

ঔষধের দোকানে প্যাকেট স্যালাইন পাওয়া যায় এবং মুদী দোকানেও এর প্রাপ্যতা তুলনামূলকভাবে কম। সমীক্ষায় দেখা যায়, থানা স্বাস্থ্য কমপেক্স ব্যাতিত গ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র কিংবা স্বাস্থ্য কর্মীদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ স্যালাইন থাকে না।

আলোচনা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডায়রিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে খাবার স্যালাইন এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর আশির্বাদে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ জীবন বেঁচে যায়। স্যালাইন উৎপাদন, ব্যবহার ও জনগণের মাঝে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্র্যাকসহ আরো কতিপয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সরকার ও বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। এ গবেষণায় মূলত: দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমত: মায়েদের তৈরি স্যালাইন কতটুকু নিরাপদ, ও দ্বিতীয়ত: তার ব্যবহার। দেখা গেছে কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ৭১% মা নিরাপদ ও কার্যকরী স্যালাইন বানাতে সক্ষম। উলেখ্য, বহু বছর পূর্বে শেখা লবন-গুড়ের স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি এখনও ভুলে না যাওয়া এ কর্মসূচির সাফল্যের প্রমাণ।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, খাবার স্যালাইনের ব্যবহার এখন ৬০%। ডায়রিয়া বা কলেরার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আরো বেশি (৮০%), তবে আমাশয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার কম। পরিশেষে আরেকটি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে। সম্প্রতি ১১-১২ বছর বয়স্ক ২,১০০ কিশোর কিশোরীর উপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা ৭০ জনই খাবার স্যালাইন সম্পর্কে জানে। সম্ভবত: খাবার স্যালাইন সম্পর্কে তারা তাদের মায়েদের কাছ থেকেই অবগত হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ডায়রিয়া চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে।

ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় প্রসূতি মৃত্যুর কারণ ও এতদ্‌সংশিষ্ট বিষয়সমূহের উপর সমীক্ষা*

রুখসানা গাজী ও ফজলুল করিম

সন্তান ধারণ ও জন্মদান প্রক্রিয়া শুধু কষ্টসাধ্যই নয় গর্ভধারিনী মায়েদের জন্য তা ঝুঁকিপূর্ণও বটে। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য তো বটেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক পরিসংখ্যানে প্রসূতি মৃত্যুর এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৫ লক্ষ প্রসূতির মৃত্যু হয়ে থাকে। আর এদের ৯৯% ঘটে থাকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর সঠিক তথ্য রাখা হয় না তবুও দু'একটি জরিপে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা হতাশাব্যঞ্জক। এ অবস্থার পরিবর্তন করা আবশ্যক।

সরকারের পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা মহিলা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ব্র্যাক ১৯৯১ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্য সেবা বঞ্চিত দরিদ্রতম মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবর্তীদের চিহ্নিত করা, প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী যত্ন নেয়ায় উদ্বুদ্ধ করা, প্রসূতি ও পাঁচ বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য বিধি পর্যালোচনা করা, প্রভৃতি।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্র্যাক আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। এজন্য তৃণমূল পর্যায়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

* Summary of the RED research report entitled 'Study on the causes and factors related to maternal deaths in WHDP programme area of BRAC' by Rukhsana Gazi and Fazlul Karim. 1994 December. 54p. (Summarized in Bangla by KE Kabir)

এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল WHDP-র আওতাভূক্ত এলাকার প্রসূতি মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করা, প্রসূতি মৃত্যুর সাথে আর্থ-সামাজিক ও প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রসব পূর্ব ও প্রসব পরবর্তী সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা, গর্ভবতী মহিলাদের নানাবিধ সমস্যা চিহ্নিত করা ও তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রসব পদ্ধতিসহ প্রসবকালীন পরিস্থিতির উপর ধারণা লাভ করা। এ লক্ষ্যে WHDP-র আওতাভূক্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার ১০টি থানায় আগষ্ট ১৯৯২ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৩ পর্যন্ত ৯১ জন প্রসূতির মৃত্যু সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। উলেখ্য, ব্র্যাকের এ কর্মসূচির আওতাভূক্ত উপরোক্ত ১০টি থানার লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৭ লক্ষ যার অর্ধেকই ভূমিহীন কৃষক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, গর্ভাবস্থায় কিংবা প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে গর্ভের সময় ও অবস্থান নির্বিশেষে গর্ভ সংক্রান্ত কোন কারণে কিংবা গর্ভ ব্যবস্থাপনার কারণে কোন মহিলার মৃত্যু হলে তাকে প্রসূতি মৃত্যু বলা হয়।

গবেষণার ফলাফল

সমীক্ষায় দেখা যায়, ৬ মাসের কর্মসূচির আওতাভূক্ত উক্ত ১০টি থানায় মোট ৯১ জন মৃত মায়েদের মধ্যে ৮০ জনেরই (৮৭.৯%) মৃত্যু হয়েছে। সরাসরি প্রসব সংক্রান্ত জটিলতায়। আট জনের মৃত্যু হয়েছে গর্ভাবস্থায় জন্ডিস ও রক্তশূন্যতায়। তিন জনের মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

সরাসরি প্রসব সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে এক্লাম্পসিয়া, প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী মাত্রাতিরিক্ত রক্তস্রাব, দীর্ঘ ও কষ্টকর প্রসব, গর্ভপাত জনিত ইনফেক্শন প্রভৃতি প্রধান। এদের মধ্যে একমাত্র টক্সিমিয়ায় মারা গেছে ৪৩ জন (৪৭.২%) এবং প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাবে মারা গেছে ১৮ জন (১৯.৮%)

জরিপে দেখা গেছে, ৯১ জনের মধ্যে সন্তান প্রসবের পর মারা গেছে ৬২ জন (৬৮.১%), এদের মধ্যে ৩৬ জন গরীব পরিবারভূক্ত। গর্ভকালীন সময়ে মারা গেছে ২৯ জন (৩১.৯%) এদের মধ্যে ২১ জন

গরিব পরিবারভূক্ত। প্রসবের পর যে সমস্ত মায়ের মৃত্যু ঘটেছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মারা গেছে প্রসবের এক সপ্তাহের মধ্যে। যে সমস্ত মা মারা গেছে তাদের অধিকাংশই ছিল ২৫ বছর বা তার কম বয়সী। স্বামী-স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর একটি সম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেছে নিরক্ষর মায়ের মৃত্যুর সংখ্যা ৯১ জনের মধ্যে ৬৯ জন (৭৫.৮%)। অনুরূপভাবে যে সমস্ত মা মারা গেছে তাদের অধিকাংশেরই স্বামীও নিরক্ষর ছিল (৭৬.৯%)। যে সমস্ত মায়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ছিল তাদের সংখ্যা ছিল ১৫ এবং ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিতদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র ৬। বাড়িতে মৃত্যু হয়েছে ৪২ জন মায়ের (৪৬.২%), ৪৫ জন (৪৯.৪%) মারা গেছে হাসপাতালে এবং ৪ জন মারা গেছে হাসপাতালে নেযার পথে। অধিকাংশ মাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীর পরামর্শ অনুযায়ী। যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক মা ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী হিসাবে চিহ্নিত ছিল। অর্থাৎ বাকিদের ক্ষেত্রে হঠাৎ জটিলতা দেখা দিয়েছে যাদের ঝুঁকির লক্ষণ ছিল না। গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত বেশিরভাগ মা প্রসব পূর্ববর্তী যত্ন (antenatal care) পাওয়া সত্ত্বেও তাদের মৃত্যু ঘটেছে। প্রশিক্ষণবিহীন পারিবারিক ধাত্রীদের হাতে হয়েছে ৩২.৯% প্রসব।

এ সমীক্ষায় আমাদের গ্রামীণ সমাজের একটি করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। অভাব অনটন, অশিক্ষা, রোগীকে জরুরী অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার জন্য পরিবহনের সমস্যা ইত্যাদি সম্ভাব্য কারণগুলোর সাথে সাথে অন্যান্য কিছু বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। যেমন– প্রশিক্ষণহীন আত্মীয়-স্বজন দ্বারা প্রসব করানো, প্রসবকালীন জরুরী অবস্থাগুলো সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অধিক সন্তানের জন্মদান, কম বয়সে সন্তান প্রসব ইত্যাদি।

উপসংহারে বলা যায়, মাতৃত্বজনিত মৃত্যু রোধ করতে হলে নিরাপদ ও কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে মায়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পারিবারিক ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। ধাত্রী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে লাগসই প্রসব ব্যবস্থাপনা, প্রসবকালীন ঝুঁকির লক্ষণ, জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মায়েদেরকে মাতৃত্বের কারণে অকাল মৃত্যুর হাত হতে বাঁচাতে হলে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মায়েদের চিহ্নিত করা বা প্রসবকালীন পরিচর্যাই যথেষ্ট নয় বরং

প্রসবকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় (Emergencey Obstetric Care) ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

পল্লী এলাকায় ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু হারে পরিবর্তন*

এফ এম কামাল

যুগ যুগ ধরে ডায়রিয়া বাংলাদেশে একটি জীবন সংহারক ব্যাধি হিসেবে পরিগণিত। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসেও বাংলাদেশ এ ভয়াবহ ব্যাধির প্রকোপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের পরেও এ ব্যাধি এখনো লাখ লাখ মানুষের প্রাণ সংহার করে চলছে।

ব্র্যাক তার জন্মলগ্ন থেকেই এ ব্যাধির করাল গ্রাস থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি হাতে নেয়। আশির দশকে ব্র্যাক ডায়রিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে লবন গুড়ের তৈরি খাবার স্যালাইন ব্যবহারের কথা ঘরে ঘরে প্রচার করে। এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ খানা বা পরিবারে খাবার স্যালাইনের উপযোগিতার কথা পৌঁছে দিয়েছে ব্র্যাক। শুধু তাই নয়, খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতিও তাদের শিখিয়েছে।

একটি দেশের মৃত্যু হার শুধু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক মান এবং আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির সঙ্গেও সম্পর্কিত। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে দেশের মানুষের সচেতনতা এ ভয়াবহ মৃত্যু হার হ্রাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনগণের, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। পল্লী এলাকায় জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ব্র্যাকের কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ 'হেল্‌থ ওয়াচ' নামে একটি পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম (surveillance system) হাতে নেয়। এ প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের কাজ ১৯৮৬ সালে মানিকগঞ্জের ৩ টি ইউনিয়নে এবং ১৯৮৭ সালে জয়পুরহাটের ৩ টি ইউনিয়নে শুরু হয়।

---

* Summary of the RED research report entitled “Changes in diarrheal death in rural Bangladesh: Findings from BRAC’s helth and demographic surveillance system 1988-1993” by F M Kamal. Watch Report No.10 October 1994. 5p. (Summarized in Bangla by Maswoodur Rahman)

আলোচ্য গবেষণায় ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৯৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়। এ গবেষণায় শুধুমাত্র ডায়রিয়া জনিত মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশেল্গষণ করা হয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কিত সব তথ্যই গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ সংগ্রহ করেন। বিশেষভাবে তৈরি প্রশ্নমালার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্মের তারিখ, পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, মৃত্যুর তারিখ ও স্থান, চিকিৎসার ধরন এবং খাবার স্যালাইনের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সদস্য যিনি মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন তার কাছে থেকে সংগৃহীত হয়।

ফলাফল

মানিকগঞ্জ এলাকায় ১৯৮৮ সালে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুহার ছিল মোট মৃত্যুর ১৯.৩% এবং জয়পুরহাট এলাকায় ছিল ২০.২%। ১৯৯০ সালে এ হার নেমে মানিকগঞ্জ এলাকায় দাঁড়ায়, ৮.৬% এবং জয়পুরহাটে ১১.৩%। ১৯৯৩ সালে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর হার উভয় এলাকাতেই বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মানিকগঞ্জ এলাকায় ১৬.৪% এবং জয়পুরহাট এলাকায় শতকরা ১৩.৪ এ পৌছে। তবে ১৯৯১ সালে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর হার জয়পুরহাট এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩.২% গিয়ে দাঁড়ায়।
দেখা যায়, গবেষণার প্রাথমিক বছরগুলোতে শিশুরাই ছিল ডায়রিয়ার প্রধান শিকার। ১৯৯০ সালের পর ৫ বছর বা তদোর্ধ্ব বয়সের শিশুরাই ডায়রিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়। ১ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়ায় মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে উভয় এলাকায় কমে এসেছে।

ডায়রিয়ায় শিশু মৃত্যুর হার উভয় এলাকায় হঠাৎ করে নেমে আসে। তবে ১৯৯১ সালে জয়পুরহাট এবং ১৯৯২ সালে মানিকগঞ্জ গবেষণা এলাকায় শিশু মৃত্যুর হার উর্ধ্বমুখী ছিল। তবে এ হারের উর্ধ্বমুখিতা কোনভাবেই ১৯৮৮ বা ১৯৮৯ সাল থেকে বেশী নয়। লক্ষণীয় হল, ডায়রিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার জয়পুরহাট এলাকাতেই বেশি।

তিন ধরনের ডায়রিয়ার মধ্যে একিউট (acute) ডায়রিয়াতেই মৃত্যু হার সর্বাধিক। এই ধরনের ডায়রিয়া উভয় এলাকাতেই মৃত্যু ঘটায় বেশি। এখানে উলেল্গখ্য যে, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত উভয় এলাকায় এ তিন

ধরনের ডায়রিয়ায় মৃত্যুর হার কম ছিল। কিন্তু এর পরে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায় বা একইরূপ থাকে। মানিকগঞ্জ এলাকায় একিউট ডায়রিয়ায় মৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমেছিলো। ১৯৯১ সালে জয়পুরহাট এলাকায় একিউট ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

১৯৮৮ সালে বিনাচিকিৎসায় ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর হার জয়পুরহাট এলাকার চেয়ে মানিকগঞ্জ এলাকায় প্রায় দ্বিগুণ ছিলো। কিন্তু ১৯৮৯ সালে উভয় এলাকায় ডায়রিয়া পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়। পরে অবশ্য এ অবস্থার আবার অবনতি ঘটে।

ডায়রিয়ায় খাবার স্যালাইনের ব্যবহার জয়পুরহাটের চেয়ে মানিকগঞ্জে তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এ উভয় গবেষণা এলাকায় খাবার স্যালাইনের ব্যবহার ১৯৮৮ সালের তুলনায় কম ছিল। মানিকগঞ্জে ডায়রিয়ায় মৃত্যুর হার এপ্রিল, মে ও নভেম্বর মাসে বেশি এবং ফেব্রুয়ারী, জুলাই ও আগষ্ট মাসে কম। জয়পুরহাট এলাকায় এপ্রিল, জুন ও অক্টোবর মাসে এ হার বেশি ছিল এবং ফেব্রুয়ারী, মার্চ, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কম।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ডায়রিয়া একটি প্রাণনাশী ব্যাধি হিসেবে রয়ে গেছে। উভয় এলাকায় দেখা যায়, যারা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, তাদের অনেকেই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি খাবার স্যালাইনের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উদাসীনতা লক্ষণীয়।

ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিঃ চিকিৎসা সমাপ্তকারী রোগীদের উপর একটি সমীক্ষা*

মোঃ নজরুল ইসলাম, শাহ্ নূর মাহমুদ, আহমেদ আলী ও ফজলুল করিম

জীবন বিনাশী যে ক'টি মারাত্মক ব্যাধি রয়েছে, যক্ষ্মা সেগুলোর একটি। প্রাপ্ত বয়স্করাই সাধারণত এ রোগের শিকার হয়। প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ৮০ হাজার লোক এ ভয়াবহ ব্যাধিতে প্রাণ হারায় এবং প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার লোক নতুন করে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত (১৯৯৪) ১৩ টি হাসপাতাল এবং ৪৪ টি যক্ষ্মা ক্লিনিকের মাধ্যমে এ ভয়াবহ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি সফল করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই এ রোগ সম্পর্কে সমাজ জীবনে নানা আতংক রয়েছে সেই সংগে নানা কুসংস্কারও রয়েছে ফলে রোগীরা চিকিৎসা নিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সহজে যেতে চায় না। এ সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে একটি থানায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। কার্যত এ কর্মসূচি শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পল্লী এলাকায় যক্ষ্মা প্রতিরোধের তেমন সরকারি কার্যক্রম দেখা যায় না। সরকারের এ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে সহায়তা করার জন্য ব্র্যাক এ উদ্যোগ নেয়।

আশানুরূপ সাড়া পাওয়ায় ব্র্যাক ১৯৯২ সালে আরো ১০ টি থানায় এ কর্মসূচি চালু করে। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ কর্মসূচির সফলতা মূল্যায়নের জন্য ১৯৯৪ সালে জুলাই মাসে একটি গবেষণা চালায়। কর্মসূচি গ্রহণের সময় থেকে ১৯৯৩ সালের জুন মাস বা তার পূর্বে যে সব যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসা সমাপ্ত করে, তাদের মধ্যে ১৮১ জনের উপর একটি সমীক্ষা চালায়। চিকিৎসা সমাপ্তকারী রোগীদের আর্থ-সামাজিক, শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসা শেষ করার পরে ৪ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যারা কাশিতে ভোগে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয় এ গবেষণায় তা-ই দেখা হয়। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ৭২ ভাগই ছিল পুরুষ। দেখা যায়, মহিলাদের চেয়ে পুরুষরাই বেশি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়।

---

* Summary of the RED research report entitled "TB case management at community level: situation of the treatment completed patients"' by MN Islam, et. at. 1994 December. 17p. (Summarized in Bangla by Maswoodur Rahman)

শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ যক্ষ্মা রোগীই ছিল ব্র্যাকের টার্গেট বা লক্ষীভূত খানা বা পরিবারের। চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৬৪.৬ ভাগ রোগীকে ১২ মাস, শতকরা ১৬.৬ ভাগ রোগীকে ৬ মাস, শতকরা ১৭.৭ ভাগ রোগীকে ৮ মাস এবং শতকরা ১.১ ভাগ রোগীকে ৯ মাস চিকিৎসা করা হয়।

যক্ষ্মা রোগীদের পূর্ণ চিকিৎসার ১ মাস পর তাদের কাশি পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষায় চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের শতকরা ২.৮ ভাগ অর্থাৎ ৫ জন রোগীর কাশিতে যক্ষ্মা জীবাণু ধরা পরে। এ ৫ জন রোগীর সকলেই ময়মনসিংহ এলাকার। এ ৫ জন রোগীর ৩ জনকে ৬ মাস মেয়াদী চিকিৎসা প্রদান করা হয়। দুই জনকে ১২ মাস চিকিৎসা করার কথা থাকলেও তা পরিবর্তন করে ৬ মাসের চিকিৎসা দেয়া হয়।

গবেষণায় দেখা যায়, চিকিৎসা প্রাপ্ত মোট ১৮১ জনের মধ্যে ৯ জন চিকিৎসা শেষ হওয়ার ১ বছরের মধ্যে মারা যায়। এর মধ্যে ৩ জনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে যেমন, ক্যানসার, মানসিক বৈকল্য ও আত্মহত্যা। সমীক্ষায় দেখা যায়, চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের শতকরা ২৪.৪ ভাগ অর্থাৎ ৪০ জন পূর্ণ চিকিৎসার পরও ৪ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশিতে ভোগে, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা ৫২.৫ ভাগ আর কোন চিকিৎসা নেয়নি।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাকের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে নজর দেয়া দরকারঃ

১. স্বাস্থ্যসেবিকাগণ চিকিৎসাপ্রাপ্ত সকল রোগীকে মাসে একবার করে খোঁজ খবর নিবেন (Follow up)। তাতে রোগীদের শারীরিক অবস্থা জানা যাবে এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। বিশেষ করে, যদি কেউ ৪ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশিতে ভোগে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হবে।
২. পুনরায় যক্ষ্মাক্রান্ত ও যারা আরোগ্য লাভ করেনি এমন রোগীদের কাশি পরীক্ষা করে (কালচার ও সেনসিটিভিটি টেস্ট) সঠিক ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা দিতে হবে।

৩. দূরারোগ্য যক্ষ্মা রোগীরা যাতে অন্যদের সংক্রমিত করতে না পারে তার জন্য নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় যক্ষ্মা নিরোধক ঔষধ দিতে হবে।

৪. সকল যক্ষ্মা রোগীদের জন্যই ৮ মাস ব্যাপী চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। এটা ব্যয় সাপেক্ষ হলেও যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য অতি প্রয়োজন।

৫. যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য স্ট্রেপটোমাইসিনের পরিবর্তে ইথামবুটল ব্যবহার করা দরকার। কারণ, এটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম এবং কার্যকারিতা বেশি।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চার উপর একটি সমীক্ষা*

হাশিমা-ই-নাসরীন, মোঃ নজরুল ইসলাম, শাহ্ নূর মাহমুদ ও ফজলুল করিম

ভূমিকা

অপুষ্টি, সংক্রমণ ও গর্ভধারণের উচ্চ হারের কারণে গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়টি মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গর্ভধারণ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সারা বিশ্বে প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ মহিলা মারা যায়। আর এসব মৃত্যুর নিরানব্বই শতাংশই ঘটে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

বাংলাদেশে প্রসূতি মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ছয়। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এটা ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। ব্র্যাকের ১৯৯১ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গর্ভধারণ ও সংশিষ্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারণে বাংলাদেশে প্রতিদিন ৬৩ জন বা বছরে ২৩ হাজার মা মৃত্যুবরণ করেন। এর প্রধান কারণ, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর পরিচর্যা যা সেবা দানের অপ্রতুলতা।

প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর সমস্যা কমানোর একটি সহজ ও সুলভ বিকল্প হচ্ছে ঝুঁকিমুক্ত প্রসব কৌশলের উপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সনাতন ধাত্রীদেরকে (Traditional Birth Attendant বা TBA) কাজে লাগানো এবং সেই সঙ্গে তাদের সেবা গ্রহণের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করে তোলা। সত্তুরের দশকের গোড়া থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সনাতন ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাদেরকে কাজে লাগানোর কর্মসূচিকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করে আসছে। বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকে এ কর্মসূচি চালু রয়েছে।

---

* Summary of the RED research report entitled "An evaluation of knowledge and practices of the trained traditional birth attendants" by Hashima-E-Nasreen, et. al. 1994 December. 60p. (Summarized in Bangla by Siddiqur Rahman)

ব্র্যাকের কর্মসূচি

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ১৯৯১ সাল থেকে টিবিএ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে, যারা বিবাহিতা, বিধবা অথবা বিচ্ছিন্ন কিংবা তালাকপ্রাপ্তা, ভূমিহীন, বছরে তিন/চারটি প্রসব করানোর অভিজ্ঞতা যাদের আছে এবং যারা ভাল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এভাবে ১০ টি থানার ১,৫০০ গ্রাম থেকে মোট ২,৩৫৫ জন ধাত্রীকে সাত দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিলো গর্ভবতী মহিলাদের সনাক্তকরণ পদ্ধতি, প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর পরিচর্যা এবং নিরাপদ প্রসব সম্পর্কিত বিষয়। প্রথম ছয় মাস প্রতি এক মাস অন্তর একটি করে রিফ্রেশার্স ট্রেনিং দেয়া হতো। বর্তমানে প্রতি তিন মাসে একবার করে এ ট্রেনিং দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীরা নিজ নিজ গ্রামে গর্ভবতী মহিলাদের সনাক্ত করেন। ব্র্যাক ও সরকার পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্র প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ করতে সংশিষ্ট সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। এসব ধাত্রীদের কাজ-কর্ম তদারক করেন ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চা এবং তাদের আচার আচরণের মূল্যায়ন করার জন্য এ গবেষণা হাতে নেয়া হয়। নিবলিখিত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখাই ছিলো এ গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

১. গর্ভবতী মহিলাদের চিহ্নিত করা বা খুঁজে বের করতে ধাত্রীরা কতোটা সফল;
২. প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর পরিচর্যার ক্ষেত্রে ধাত্রীদের সেবা দানের মান;
৩. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব করানোর ক্ষেত্রে ধাত্রীদের কৌশল;
৪. সেবা কেন্দ্রগুলোতে ব্র্যাক চিহ্নিত গর্ভবতী মহিলাদের উপস্থিতির আনুপাতিক হার;
৫. ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের চিহ্নিতকরণের আনুপাতিক হার;
৬. উদ্ভূত জটিলতার মোকাবিলায় ধাত্রীরা যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান; এবং

৭. গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে পুষ্টি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা যেমন, স্তন্যদান, পরিপূরক খাদ্য প্রদান ও টিকাদান সম্পর্কে মায়েদের জ্ঞান।

গবেষণা পদ্ধতি

ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত ৩০টি এলাকাতেই এ গবেষণা চালানো হয়। প্রত্যেক এলাকা থেকে একটি করে গ্রাম নির্বাচন করা হয়।

প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর পরিচর্যা ও প্রসবের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে প্রাপ্ত রিপোর্টের যথার্থতা যাচাই করার জন্য ১৯৯২ সালের ১৬ আগষ্ট থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব মহিলা সন্তান প্রসব করেছেন, তাদের প্রসবকালীন অবস্থা জানার জন্য ৪৩২ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তাদের মধ্যে ৫০ জন ধাত্রী ও ৫০ জন প্রসবকালে সেবা দিয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা তাদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

গবেষণার ফলাফল

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীরা গবেষণাধীন গর্ভবতী মহিলাদের মাত্র ১৮ শতাংশের সন্তান প্রসব করিয়েছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসবপূর্ব পরিদর্শনের কাজ করেছেন ৮৭ শতাংশ ধাত্রী। শতকরা ৭৪ ভাগ ধাত্রী মনে করেন, গর্ভকালীন সময়ে বাড়তি খাবার একান্ত প্রয়োজন। গর্ভকালীন সময়ে ভারী কাজ করা যাবে না এ সম্পর্কে জানেন ৭২ শতাংশ ধাত্রী। ধাত্রীগণ শতকরা ২০ ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাকে সনাক্ত করেছেন, যার ৩০ শতাংশ পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। গর্ভকালে ধনুষ্টংকারের টিকাদান সম্পর্কে ধারণা রাখেন প্রায় শতকরা ৫৮ ভাগ ধাত্রী। ৭৬ শতাংশ গর্ভবতী মা টিকা নিয়েছেন। অধিকাংশ গর্ভবতী মহিলাই পরিপূরক লৌহ উপাদানপূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করেননি। তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭২ ও ৫৮ শতাংশ।

প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসম্মত নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞান আছে অধিকাংশ ধাত্রীর। প্রসব করানোর পূর্বে ৮৪ শতাংশ ধাত্রী সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেন এবং তাদের ৬৮ শতাংশ পরিধেয় বস্ত্র পাল্টে নেন। নাড়ি কাটার জন্য নতুন বেড়ি ও নাড়ি বাঁধার জন্য নতুন সূতা ব্যবহার করেন ৯২ শতাংশ ধাত্রী। শতকরা ৯৬ ভাগ নাড়ি কাটার উপকরণাদি জীবাণুমুক্ত করে নেন। তবে অধিকাংশ ধাত্রীই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শেখানো নাড়ি কাটার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন না। কেবলমাত্র বগুড়া অঞ্চলের ধাত্রীরা এ পদ্ধতি মেনে চলেন। কিছু সংখ্যক ধাত্রী নাড়ী কাটার পর নাড়ীতে 'মলম', সিঁদুর, তেল ইত্যাদি লাগানোর জন্য মায়েদের উপদেশ দিয়েছেন।

প্রায় ৫৮ শতাংশ ধাত্রী বলেছেন প্রসবের পর আধ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল বের হয়ে আসা উচিত। এ সম্পর্কে ৬৪ শতাংশ ধাত্রী জানান, প্রাকৃতিক নিয়মেই তা বের হয়েছে। ৩৪ শতাংশ জানান, তারা গর্ভফুল বের করার উদ্দেশ্যে তলপেটে মালিশ করেছেন এবং ২ শতাংশ হাসপাতালের সাহায্য নিয়েছেন। প্রসবের সময় ও তার আগে বা পরে জটিলতা সম্পর্কে ধাত্রীদের সীমিত ধারণা রয়েছে। উদ্ভুত জটিলতা মোকাবিলায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বেশীরভাগ ধাত্রীর একটা মোটামুটি ধারণা রয়েছে। ধাত্রীদের ৯৪ শতাংশ প্রসবোত্তরকালে মায়েদের দেখতে গেছেন। শিশুকে শালদুধ ও বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদের পরামর্শ দিয়েছেন ৯২ শতাংশ ধাত্রী। শালদুধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রয়েছে ৭৮ শতাংশ ধাত্রীর। শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে শুরু করে ২ বছরের মধ্যে টিকা দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মাত্র ৬২ শতাংশ ধাত্রী। শিশুর পাঁচ মাস বয়স থেকে পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর উপর জোর দিয়েছেন ৬০ শতাংশ ধাত্রী। অধিকাংশ ধাত্রী বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের সকল ধরনের খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রায় ৩৪ থেকে ৩৮ শতাংশ ধাত্রী এ সময়ে মায়েদের মাছ, মাংস, ডিম ও শাক-সবজি ইত্যাদি বাড়তি খাবার খেতে বলেছেন, সেই সঙ্গে প্রচুর পানি পান করার পরামর্শও দিয়েছেন।

উপসংহার

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে যদিও কিছু ক্ষেত্রে একটা উৎসাহব্যঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়, যেমন, প্রসব করানোর সময় ধাত্রীরা কাপড় পাল্টে নেন, নাড়ি কাটার জন্য নতুন ব্লেড এবং নাড়ি বাঁধার জন্য নতুন সূতা ব্যবহার করেন।

গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের এবং শিশুদের মৃত্যুহার হ্রাস করা তথা তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে ধাত্রীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাকের আর ও পদক্ষেপ নেয়া উচিত। তবে এর সম্প্রসারণ ও নিবিড়করণের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

সুপারিশমালা

১. ব্র্যাকের পক্ষে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা গ্রামীণ ধাত্রীদের কাজের তদারকি নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে সরকারের স্থানীয় স্বাস্থ্য কাঠামোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।
২. গ্রামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের উপস্থিতি সম্পর্কে গর্ভবতী মহিলা ও তাদের অভিভাবকদের (স্বামী, শাশুড়ি) অবহিত করানোর কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৩. গর্ভধারণ, প্রসব, সন্তান ও প্রসূতির পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার-আচরণ পাল্টে দেয়ার লক্ষ্যে মহিলা সভা, গ্রাম কমিটি, গ্রুপ মিটিং এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ ইত্যাদির উপর জোর দিতে হবে।
৪. প্রশিক্ষণবিহীন গ্রাম্য ও পারিবারিক দাই বা ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব-কৌশল চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর ফল লাভ করা যায় এবং মা ও শিশুর মৃত্যু হার হ্রাস পায়।
৫. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবের পেছনে কী কী নিয়ামক কাজ করছে, সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য আরো গবেষণার দরকার।